31

35236

Senior Basic Trg.
College.

বুদ্ধদেব বসুর

ছোটোদের শ্রেষ্ঠগল্প

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

বুদ্ধদেব বসু-র

ছোটোদের বইয়ের তালিকা

রঙিন কাচ
*ঘুম-পাড়ানি
এলোমেলো
*জলতরঙ্গ
*শনিবারের বিকেল
*কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড
*সাগর-রহস্য (প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে)
*আজগুবি জানোয়ার („)
এক পেয়ালা চা
পথের রাত্রি
গল্প-ঠাকুর্দা
অপরূপ রূপকথা
(হান্স আণ্ডেরসেনের অনুবাদ :
নতুন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
হাউই (অস্কার ওয়াইল্ডের অনুবাদ)
*ঘুমের আগের গল্প
*ভদ্রতা কাকে বলে
দস্যুর দলে ভোমরা (নতুন সংস্করণ যন্ত্রস্থ)
ভূতের মতো অদ্ভুত
ছায়া কালো-কালো
কালবৈশাখীর ঝড়
তাসের প্রাসাদ
জ্ঞান থেকে অজ্ঞান (যন্ত্রস্থ)
রান্না থেকে কান্না („)
বারো মাসের ছড়া („)

*চিহ্নিত বইগুলি বর্তমানে ছাপা নেই

বুদ্ধদেব বসুর ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রথম প্রকাশ :
মে, ১৯৫৫
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২
প্রকাশ করেছেন :
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২
ছেপেছেন :
শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদ :
মণীন্দ্র মিত্র
ভিতরের ছবি :
কার্তিক মজুমদার, বিমল দাস
দু-টাকা

পাপ্পার জন্য

‘ওদের জন্য অনেক লিখেছো গল্প,
আমার বেলায় বুঝি এইটুকু অল্প !’
—উত্তরে আমি এই কথা লিখে রাখি :
আকাশে আমিও ভাসিয়েছিলাম ভেলা,
আলোয় খেলায় কেটে গেছে সারা বেলা ;
কিন্তু আঁধারে ঘরে ফেরে সব পাখি।

১২ মে, ১৯৫৫

১৯৩০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পরীক্ষা শেষ ক'রে গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় এসেছি। বন্ধু অচিন্ত্যকুমার আলাপ করিয়ে দিলেন 'মৌচাক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সরকারের সঙ্গে। ছেলেবেলায় 'মৌচাক' পড়েছি; মূঢ়ের মতো লেখাও পাঠিয়েছি অনেক বার; সেগুলোকে আবর্জনাকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলেন ব'লে সম্পাদকের কাছে আজ পর্যন্ত কৃতজ্ঞ আছি। কিন্তু সেদিন তাঁর দু-একটা কথায় মনে হ'লো যে আমার শৈশবের উচ্চাশার লক্ষ্যস্থল সেই 'মৌচাক' পত্রিকা এখনো আমার সচেষ্টতায় আস্থা হারায়নি। তাতে আমার মনে এতদূর উৎসাহ জাগলো যে ঢাকায় ফিরে গিয়েই একটি গল্প লিখে 'মৌচাকে' পাঠিয়ে দিলুম। সেই আমার প্রথম ছোটোদের গল্প: 'প্রাইজ'।

তার পর থেকে বহুকাল ধ'রে অনবরত ছোটোদের গল্প লিখেছি। অনেক বই বেরিয়েছে, অনেক বই বেরোয়নি; কোনো-কোনো বই ছাপার ভুলের শরশয্যায় জীবন্মৃত; কোনো-কোনোটি একটিমাত্র সংস্করণের পরেই বৈতরণীর ঘাটে এসে ব'সে আছে। আজকের দিনে আমার পক্ষে, এমনকি, সবগুলো বই চোখে দেখাও সহজ নয়, আর সাময়িকপত্রের ছিন্নপত্র থেকে অন্যান্য গল্প উদ্ধার করা আরো বেশি পরিশ্রমসাপেক্ষ। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে গিয়ে লজ্জার সঙ্গে আবিষ্কার করলাম যে আমার লেখার পরিমাণ একটি ছোটো সংকলনগ্রন্থের পরিসরের পক্ষে অবাধ্যরকম অত্যধিক।

অতএব, যাঁরা দৈবাৎ আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত আছেন, তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখছি এই বইটির অসম্পূর্ণতার জন্য। কিন্তু অসম্পূর্ণ হ'লেও বইটি অসার্থক নয়; নানা রকমের নমুনা আছে এতে, লেখকের মনের চেহারাটা কী রকম, তার জগতে কোন রকমের মানুষের বাসা, সেটুকু অন্তত বোঝা যাবে। গল্পগুলো আবার প'ড়ে আমার ধারণা হ'লো যে আমার 'বড়োদের' আর 'ছোটোদের' লেখা মূলত ভিন্ন নয়; একই ভাব, একই চিন্তা—কখনো-কখনো একই মেজাজ—দুয়েরই মধ্য দিয়ে প্রকাশের জন্য প্রয়াসী। মনের মধ্যে যখন যে-রকম বদল ঘটেছে, তার চিহ্ন দুই বিভাগেই সুস্পষ্ট। আমার অল্প বয়সের গদ্য লেখায় হাসিঠাট্টা খুব বেশি থাকতো, সেই ঝোঁক ক্রমশ কেটে গিয়ে

শেষের দিকে আমার ছোটোদের গল্পও কিছুটা যেন গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। এই বইয়ের শেষ গল্প 'হারান-জ্যাঠা ও সুজিত-দা' আজ থেকে সাত-আট বছর আগেকার লেখা; রচনাগুলির সংস্থানে যদিও আগাগোড়া কালক্রম বজায় রাখা সম্ভব হয়নি, তবু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লে এই পরিবর্তনের একটা ছবিও হয়তো পাওয়া যাবে। আজকাল কাউকে ব্যঙ্গ ক'রে গল্প লিখতে একেবারেই উৎসাহ পাই না আমি; বোধহয় সেটা একটা কারণ, যার জন্য 'হাসির গল্প' আর লিখতে পারি না, প্রায় কোনো রকম ছোটোদের গল্পই নয়।

'প্রথম দুঃখ', 'যা চাও তা-ই', 'হারান-জ্যাঠা ও সুজিত-দা' এই তিনটি গল্প ইতিপূর্বে কোনো বইয়ের মধ্যে স্থান পায়নি। 'প্রাইজ' গল্পটির পুনর্মুদ্রণের জন্য দেব-সাহিত্য কুটির, এবং 'একটা পরির গল্প', 'ট্যানির ভাবনা' ও 'বিশেষ-কিছু নয়' এই তিনটি গল্পের জন্য নব-ভারতী অনুমতি দিয়েছেন; তাঁদের আমার ধন্যবাদ জানাই। গল্পগুলিতে অনেক অদল-বদল করা হ'লো।

মে, ১৯৫৫ বু. ব.





বরঞ্চ খবরের কাগজওয়ালাদের হাঁকডাকের চোটে ভারতবর্ষ এক সেকেণ্ডে স্বাধীন হ'য়ে যেতে পারে, কিন্তু বিরিঞ্চি কোনো পরীক্ষায় কখনো সেকেণ্ড হবে না—ঢাকা কলেজিয়েট-স্কুলের থার্ড ক্লাশের ছেলেদের এই ধারণা। অন্তত এতকাল তা-ই ছিল। কিন্তু এবারকার অ্যান্নুয়েলে অসম্ভব হয়েছে সম্ভব ; কিষ্কিন্ধ্যার অঞ্চল থেকে—কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কে একজন উড়ে এসে জুড়ে বসলো ; হনুমানের মতোই প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়ে অ্যান্নুয়েল পরীক্ষা উৎরোলো—বিরিঞ্চিকে ছিয়াত্তর নম্বর পেছনে ফেলে ! সারা স্কুলে সাড়া প'ড়ে গেছে।

অথচ, শিবু যেদিন প্রথম স্কুলে এসে ভর্তি হ'লো, কে এত কথা ভাবতে পেরেছিলো ! দেখতে ছোট্ট, রোগা, ময়লা, মাথার চুল কদমফুলের মতো ক'রে ছাঁটা, ঢিলে পায়জামার উপর জিনের কোট চাপানো, পায়ে নোংরা নাগরা—ওকে দেখে বিরিঞ্চি এণ্ড কোম্পানি তো হেসেই বাঁচে না। বিরিঞ্চি দেখতে ভালো, মোটরে চ'ড়ে স্কুলে আসে, তার উপর ক্লাশ থ্রী থেকে সে বরাবর ফার্স্ট হ'য়ে আসছে, সুতরাং—বাকিটা না-বললেও চলে।

তাই ব'লে বিরিঞ্চির দেমাক-টেমাক নেই। সে-ই প্রথম দিন গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে গিয়েছিলো শিবুর সঙ্গে। সেদিনকার ঘটনা বিরিঞ্চি জীবনে ভুলতে পারবে না।

শিবুর বাবা চাকরি করেন কোন-এক পট্টমে—সেখানেই শিবুর জন্ম এবং এই তেরো বৎসর যাপন। ফলে বাংলাটা বলে ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু তার মুখে ইংরিজির খই ফোটে। সত্যি কথা বলতে কী, বিরিঞ্চির বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা শিবু যতটা বুঝতে পেরেছিলো, শিবুর সাহেবি-ঘেঁষা ইংরিজি বিরিঞ্চি বুঝেছিলো তার চেয়ে ঢের কম। সুতরাং আলাপ জমেনি। বিরিঞ্চি অবশ্য বন্ধুদের কাছে ব্যাপারটা রং ফিরিয়ে বলেছিলো—তাই সে-যাত্রায় তার মুখ-রক্ষা হ'লো। কিন্তু মন তার শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো।

শনিবার থার্ড পিরিয়ডে যিনি ট্রান্সলেশন করান, তিনি নতুন মুখ দেখে যখন শিবুর নাম জিগেস করলেন, শিবু উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বললে, 'ডিবদাs রায়।' অমনি সবাই—মায় স্যর নিজে—হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। শিবুর কান ছুটো ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো।

স্যর তখন আড়চোখে শিবুর পায়জামার দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'Are you a Bengali ?'

শিবু দৃঢ় স্বরে জবাব দিলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম শিবদাস।'

যাক, সেদিনকার মতো ব্যাপারটা সেখানেই চুকলো। বিরিঞ্চি মনে-মনে একটু খুশি না-হ'য়ে পারলো না; এবং ক্লাশের ফাজিল ছেলেগুলো শিবুকে দেখলেই 'ডিবদাs' বলে চেঁচিয়ে উঠতে লাগলো।

এক সপ্তাহ এই চললো, কিন্তু শিবু একটুও ঘাবড়ালো না। কিন্তু পরের শনিবার সেই মাস্টার-মশাইয়ের উপর সে নিলে প্রতিশোধ। তিনি দিব্যি পড়িয়ে যাচ্ছিলেন, শিবু হঠাৎ তুখোড় ইংরিজিতে ব'লে উঠলো, 'ওটা কাপবোর্ড নয়, স্যর—কাবার্ড।

এইবার মাস্টার-মশাইয়ের কান ঝাঁ-ঝাঁ করার পালা। রীতিমতো

রেগে গিয়ে তিনি বললেন, 'তোমার ভারি সাহস তো হে ছোকরা—আমার ভুল ধরতে আসো !'

শিবু দিব্যি হাসিমুখে বললে, 'আমার দোষ কী বলুন ? এতগুলো ছেলে ভুল শিখবে, এ আমি সইতে পারিনে।'

তারপর রীতিমতো একটা কাণ্ড হ'য়ে গেলো। স্যর আগুন হ'য়ে বললেন, 'রোসো, ডেঁপো ছোকরা—তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। এক্ষুনি চললুম হেডমাস্টারের কাছে ; তোমাকে আজকে বেত না খাইয়েছি তো আমি চাকরিই ছেড়ে দেবো।' ব'লে রাগে গজগজ করতে-করতে তিনি ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ছেলেরা সব হতভম্ব। শিবু হাত-পা নেড়ে ইংরিজি উচ্চারণ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুরু ক'রে দিলে। ছেলেটাকে এক্ষুনি লিকলিকে বেতের ঘা খেতে হবে মনে ক'রে বিরিঞ্চি কাঁদো কাঁদো হ'য়ে গেলো।

খানিক বাদেই হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে শিবুর ডাক পড়লো। ব্যাপারটা কী হয়, জানবার জন্য কয়েকটি ছেলে শিবুর পিছন-পিছন গিয়ে বাইরের বারান্দায় ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। মিনিট দশেক পরে শিবু বেরিয়ে এলো অক্ষত দেহে এবং সেই স্যরটি ম্লানমুখে। ক্রমশ শোনা গেলো যে, হেডমাস্টারমশাই শিবুকে সৎ-সাহসের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন, এমনকি, তার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করেছেন পর্যন্ত, এবং মাস্টার-মশাইকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে খামকা খিটিমিটি করবার জন্য ধমকে দিয়েছেন।

এর পর থেকে শিবুকে মুখের উপর ঠাট্টা করতে কেউ আর সাহস পায় না ; এমনকি, অনেক ছেলেই—এবং কোনো কোনো মাস্টারও—তাকে সমীহ ক'রে চলে। ক্লাশের কোনো ছেলে তার সঙ্গে কথা বলে না ; টিফিনের সময় গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে একা-একা চিনেবাদাম চিবোয়। বিরিঞ্চির মনে হ'লো, হেডমাস্টারের কাছে এই গৌরবটা তারই পাওয়া উচিত ছিলো, এবং শিবু যে অত ভালো ইংরিজি জানবে, এটাতেও যেন তার মন সায় দিতে চাইলো না। বিরিঞ্চির মনে

অবশ্যি হিংসে নেই, কিন্তু তাকে শিবুর সঙ্গে কথা বলতে কেউ কখনো দেখতো না। শিবু দরকার হ'লে সকলের সঙ্গেই কথা বলতো, কিন্তু যাকে গল্প করা বলে, তা সে কারো সঙ্গেই করতো না। বিরিঞ্চির চারদিকে ক্লাশের সব ছেলেরা ভোমরার মতো গুনগুন করে, আর সারা স্কুলে শিবুর সঙ্গী শিবু নিজে। শিবু থাকে হস্টেলে—সেখানকার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তাদের হিস্ট্রির টিচার, অবিনাশবাবু। অবিনাশবাবুর ছ-বছরের ছেলেটি বাপের সঙ্গে থাকে—নর্ম্যাল স্কুলে পড়ে। মাস-খানেক না-যেতেই সে শিবু-দার বেজায় ন্যাওটা হ'য়ে পড়লো। পল্টু শিবুর টেবিল গুছোয়, দোকান থেকে টুকটাক কাগজ পেন্সিল এনে দেয়; শিবু স্কুল থেকে ফিরে ছাতে ব'সে পল্টুকে গল্প শোনায়—অদ্ভুত, আজগুবি সব গল্প। তবু—শিবু যে একা, সে একা।

হাফ-ইয়ার্লিতে বিরিঞ্চির কান ঘেঁষে বন্দুকের গুলি চ'লে গেলো; শিবু সবগুলো সবজেক্টে ফার্স্ট, কিন্তু বাংলায় সাঁইত্রিশ পেয়ে মোটের উপর তিন নম্বরের জন্য সেকেণ্ড হ'য়ে গেলো। বিরিঞ্চির সম্মানটা কোনোরকমে বজায় রইলো, কিন্তু বিরিঞ্চি একমাত্র বিরিঞ্চি নয়, এ-কথা বুঝতে কারোরই বাকি রইলো না। বিরিঞ্চি সাতাশে জুলাই, সোমবার থেকে রোজ দশ ঘণ্টা ক'রে পড়া শুরু করলে। তবু—তবু—ওর নৌকো ডুবলো। অ্যানুয়েলে শিবু বাংলায় মেরে দিলে বিরানব্বুই। আর যাবে কোথায়? পাঁচ বছর যাবৎ বিরিঞ্চি প্রত্যেক-বার পেট থেকে গলা অবধি প্রাইজ-বই নিয়ে বাড়ি ফেরে—এবার সবগুলো প্রাইজ উঠলো শিবুর নামে—মায় গুড কণ্ডাক্ট, রেগুলার অ্যাটেনডেন্স। বিরিঞ্চির জন্য শুধু একটি প্রাইজ—সেকেণ্ড প্রাইজ।

কাল প্রাইজ-ডে। বিরিঞ্চির মুখের দিকে তাকানো যায় না; কিন্তু শিবুর হাবে-ভাবে কোনো বদল নেই—তার যেন কিছুই হয়নি। আগুন ছুঁলেই যেমন হাত পোড়ে, পরীক্ষা দিলেও তেমনি এমনিতর ফার্স্ট হ'তে হয়—তার মুখের ভাবখানা এই।

প্রাইজ-ডিস্ট্রিবিউশন হ'য়ে গেছে; সন্ধে হয়-হয়—অভ্যাগত ভদ্রলোকেরা যে যাঁর বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন, প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে ছোটো-ছোটো দল বেঁধে ছেলেরা এখনো জটলা করছে। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে একটা গাছের আড়ালে শিবু একা ব'সে আছে—তার সামনে এক গাদা বই ছড়ানো। কমিশনার সাহেব তার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করেছেন, কমিশনার-পত্নী তার হাতে বই তুলে দেবার সময় প্রত্যেক-বার মিষ্টি ক'রে হেসেছেন, তিন বার সমবেত ভদ্রমণ্ডলী তাকে উৎসাহ দিয়ে হাততালি দিয়েছেন—কিন্তু এখন, এখন সে একা—চব্বিশখানা প্রাইজের বই নিয়ে একা।

এদিকে বিরিঞ্চি মাত্র একটি প্রাইজ পেয়েছে—দু-খানা বই; কিন্তু সে প্রাইজ নিয়ে বেরিয়ে আসা মাত্র থার্ড ক্লাশের অর্ধেক ছেলে তার সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, উৎসুক হ'য়ে জিগেস করেছে, 'দেখি, কী বই পেলি?' বিরিঞ্চি বই দেখিয়ে আবার সযত্নে ফিতে বেঁধে রেখেছে। বাড়ি থেকে তার বাবা, মা, ভাই-বোন সবাই এসেছে, সভা ভেঙে যাওয়ার পর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সবাই—ঐ তো, শিবু তাদের দেখতে পাচ্ছে। বিরিঞ্চি একটি মাত্র প্রাইজ পেয়েছে—দু-খানা মাত্র বই—তাতেই ওরা কত খুশি! বই দু-খানা সবাই হাতে নিয়ে-নিয়ে দেখছে—ছোটো ভাইটা হাততালি দিয়ে লাফাচ্ছে, ছোটো বোন বেণী দুলিয়ে-দুলিয়ে কতই না কথা বলছে! মা-বাবার মুখ কেমন হাসিতে ভরা। ঐ, ওরা আসছে—বিরিঞ্চি ওর পাশ দিয়েই হেঁটে গেলো, কিন্তু ও এখন কোনোদিকেই তাকাচ্ছে না—মা-র সঙ্গে গল্প করছে। শিবুর সঙ্গে রেষারেষির ওর এখন সময় নেই।···ওরা সবাই গিয়ে মোটরে উঠলো।

তারপর শিবু একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে তার চব্বিশখানা বই নিয়ে হস্টেলে ফিরলো। অন্ধকার ঘর;—শিবু টেবিলের উপর ধুপ ক'রে বইগুলোকে এনে ফেললে।

পল্টু তার আওয়াজ পেয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বললে, 'কই, দেখি শিবু-দা, কী-কী বই পেলে?'

শিবু ঘরের আলো জ্বেলে বললে, 'আমার কোনো চিঠি এসেছে রে?'

'জানি না—না বোধহয়। কই, দেখাও না বই!'

'বল না আমার কোনো চিঠি আছে কিনা!' ব'লে সে চিঠির আশায় টেবিলের কাগজপত্র ওলোট-পালোট করতে লাগলো।

পল্টু শিবুর হাত ধ'রে আবদারের সুরে বললে, 'বা রে, বই দেখাবে না?

'ফের দুষ্টুমি!' ব'লে শিবু ঠাশ ক'রে পল্টুর গালে এক চড় বসিয়ে দিলে।

পল্টু নিতান্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেললে।

শিবু তখন ওর গায়ে হাত বুলিয়ে, মিষ্টি কথা ব'লে, আদর ক'রে—নানা ভাবে ওর কান্না থামাবার চেষ্টা করতে লাগলো। পল্টু কিছুতেই শান্ত হয় না। শেষটায় শিবু বললে, 'এই সবগুলো বই তোকে দিলাম—নে।'

'সত্যি?' হঠাৎ পল্টু হেসে ফেললো। 'সত্যি বলছ, শিবু-দা?'

'সত্যি রে, সত্যি। তুই আয় এখানে, পল্টু—টেবিলটার উপর উঠে বোস। কত সুন্দর ছবি আছে, দেখবি।'

পল্টু এক লাফে টেবিলের উপর চ'ড়ে বসলো, আর শিবু একে-একে তার চব্বিশখানা বই থেকে ছবি দেখালে তাকে। এতক্ষণে শিবুর মন অনেক হালকা হ'য়ে গেছে।



খোকার ঘুম আসছে না। অন্য সব দিন সন্ধে হ'তে-না-হ'তেই সে ঘুমিয়ে পড়ে ; আর আজ কিনা মা বাড়ি নেই, আজ কিনা দিদিকে দেয়া হয়েছে ওকে রাখতে, তাই—ছাখো কাণ্ড !—খোকার চোখে নেই ঘুম। দিদি—বাড়ির লোক তাকে ডাকে রান্নু ব'লে ; আর, রান্নু যার নাম, সে খোকাকে কী ক'রে সামলাবে বলো তো, খোকা যদি ঠিক সময়ে না ঘুমোয়, যদি করে দুষ্টুমি ?

দোতলার একপাশে খোলা ছাত, সেখানে তক্তাপোশে রান্নু বসেছে খোকাকে নিয়ে। সন্ধে হ'য়ে গেছে, পশ্চিমের আকাশে দেখা দিয়েছে এক টুকরো বাঁকা চাঁদ, রং তার রুপোর মতো। খোকাকে হাঁটুর উপর বসিয়ে দোলা দিতে-দিতে রান্নু বলছে, 'খোকা, তুই ঘুমো, তুই ঘুমো। খোকা, তুই ঘুমো।'

মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে খোকা ব'লে উঠছে, 'ন্‌ন্‌না।'

'না কী রে ?' খোকাকে কোলের উপর চেপে ধ'রে রান্নু তার চুলে বিলি কেটে দিতে লাগলো, 'ঘুম, ঘুম, ঘুম। খোকা, লক্ষ্মী, সোনা। এই বুঝি এলো ঘুম, ঘুম এলো। তোমরা কেউ গোল কোরো না, আমাদের খোকা এখন ঘুমুবে। চাঁদ উঠেছে আকাশে, ছোট্ট চাঁদ, বাঁকা চাঁদ, এক মুঠো চাঁদ। চাঁদ তাকিয়ে আছে খোকার

ঘুম দেখবে ব'লে। চাঁদ, আমাদের খোকার চোখে তুমি ঘুম দিয়ে যাও। যেখানে ঘুমের দেশ, রাশি-রাশি ঘুম যেখানে ছড়িয়ে আছে মেঘের মতো, সেখান থেকে একটু ঘুম তুমি চুরি ক'রে আনো আমাদের খোকার জন্য, খোকার জন্য। চাঁদ, চাঁদ, চাঁদ, খোকার চোখে তুমি ঘুম দিয়ে যাও—'

হঠাৎ খোকা মাথা তুলে সোজা তাকালো তার দিদির দিকে। খোকার চোখ নীল, খোকার চোখ ভরা নীল হাসি। খিলখিল ক'রে সে হেসে উঠলো। বললো, 'চাঁদ!'

'তুই যাবি চাঁদে?'

'চাঁদে বুঝি কেউ যায়? চাঁদ কি ধুম্‌তলা?'

'ধুম্‌তলা নয়, ধরমতলা। চাঁদ তুই ধরবি, এমনি মুঠো ক'রে, হাতের মধ্যে?'

খোকা তার দিদির আঁচল আঁকড়ে ধ'রে বললে, 'এমনি—দু-হাতের মধ্যে?'

'হ্যাঁ, দু-হাতের মধ্যে। তুই যদি এখন ঘুমিয়ে পড়িস, তাহ'লে ঘুমের মধ্যে আসবে এক পরি—'

'—ট্যাক্সিতে চ'ড়ে।'

'দূর বোকা—পরি কেন ট্যাক্সি চড়তে যাবে? তার যে পাখা আছে। উড়ে আসবে সে জানলা দিয়ে, এসে বসবে তোর শিয়রে—উঃ, মাকে যে আজ কী বেড়াবার ভূতে পেয়েছে—'

'তাপরর কী হবে?'

'তাপরর নয়, তারপর। তারপর তুই জেগে উঠে দেখবি, তোর বালিশের কাছে চাঁদ গড়াগড়ি যাচ্ছে।—এখনো যেন ফিরলে দোষ হয়!'

'যদি প'ড়ে যায়? প'ড়ে ভেঙে যায়?'

'তাহ'লে জেগে উঠে কাঁদবি—অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ। বলবি—আমার চাঁদ ভেঙে গেলো, চাঁদ—উঁ—উঁ—উঁ। আর ও-বাড়ির মন্টু এসে

বলবে, "তোমাদের খোকার মতো এমন অদ্ভুত ছেলে আর দেখিনি গো। এত বড়ো হ'লো—এখনো কিনা কাঁদে!" '

'ঈশ!' খোকা ছোট্ট এক চড় বসিয়ে দিলো দিদির গালে। 'কাঁদবো না আরো কিছু!'

'তেজ ছাখো ছেলের, কথায়-কথায় মারতে ওঠেন। লাগে না বুঝি? দস্যি কোথাকার! মা একবার আসুন না। কী যে তাঁদের বেড়ানো, শেষ আর হয় না। আর যদি আমি কখনো—'

'তাহ'লে তুমি বলো, আমি কাঁদবো না।'

'না, কাঁদবেন কি আর! চেঁচিয়ে শুধু একটু পাড়া মাথায় করবেন। এমন অসভ্য ছেলের কাছে আবার পরি আসবে!'

'না আসুক, চাই না পরি।'

'চাঁদও পাবি না ধরতে।'

'আকাশে উড়ে গিয়ে আমি চাঁদ ধরবো।'

'বাঃ খুব মজা তো! আমাকে নিয়ে যাবি সঙ্গে?'

'কী ক'রে নেবো? তুমি তো কত বড়ো।'

'আমি খুব ছোটো হ'য়ে যাবো—একেবারে এইটুকু। তখন আমাকে পকেটে ভ'রে—

'ঈশ, হও তো ছোটো?'

'তুই না-ঘুমোলে কী ক'রে ছোটো হবো? তোকে কোলে নেবে কে?'

'আচ্ছা বেশ, নেমে যাচ্ছি আমি,' খোকা নিচের দিকে পা বাড়িয়ে দিলো। 'এবার হও ছোটো।'

'না, না, এখন তোকে নামতে হবে না।' রাত্নু খোকাকে চেপে ধ'রে রাখলো, 'নাঃ। বড্ড বাড় বেড়েছিস তুই।'

খোকা ছাড়া পাবার জন্য পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে বললে, 'আমি উড়বো।'

'কী ক'রে উড়বি?'

'পাখি তো ওড়ে।'

'তুই কি পাখি?'

'আমি পাখি হবো।'

'পাখি হবি? শোন তবে একটা কথা। তুই যদি এখন ঘুমিয়ে পড়িস—'

'না, না, ঘুমোবো না।'

'শোন না।—নাঃ, কী আব্দার ছাখো, ওঁরা সব বেড়াবেন মজা ক'রে, আর আমি এদিকে—হ্যাঁ, শোন, তুই যদি এখন ঘুমিয়ে পড়িস, কী যে মজা হয় একটা! কী হয়, বল তো? তাহ'লে এই তুই আছিস তো, আমাদের খোকা, লক্ষ্মী খোকা, আমাদের মিষ্টি খোকা—আস্তে-আস্তে তুই হ'য়ে যাবি একটা পাখি, ছোট্ট পাখি, হলদে পাখি, ফুরফুরে পাখি। আমি যাবো অবাক হ'য়ে—বলবো, ও মা! আমাদের খোকা যে পাখি হ'য়ে গেছে!—এদিকে আমার যে হিস্ট্রির পড়া তৈরি করতে হবে—'

'তারপর?'

'তারপর তুই যাবি উড়ে, অনেক দূরে, অনেক দূরে, আকাশ যেখানে ধূ-ধূ করছে, চাঁদ যেখানে চুপ ক'রে ব'সে আছে—হিস্ট্রির টিচার আবার যা বদমেজাজি—'

'আর তুমি?'

'আমি দাঁড়িয়ে থাকবো ছাতে, তোকে দেখবো, দেখবো, দেখবো, তারপর তুই যাবি নীল মেঘের মধ্যে মিলিয়ে।—আর হিস্ট্রিটাই আমি একদম মনে রাখতে পারি না। দেখি, আকবর কোন সালে রাজা হয়েছিলেন? ঐ যাঃ—'

'তাপরর, দিদি?'

'তাপরর! তাপরর! তুই কি কোনোদিন ভালো ক'রে কথা বলতে শিখবি না? তারপর তুই যাবি চাঁদের কাছে—কিন্তু তুই

মোটে ঘুমোবিই না তো কী ক'রে কী হবে। না-ঘুমোলে কি আর পাখি হওয়া যায়!'

'চাঁদ কথা বলবে আমার সঙ্গে?'

'চাঁদ বলবে: ছোটো ছেলে, তুমি ঘুমোও, ছোটো পাখি, তুমি ঘুমোও। ঘুম, ঘুম। ঘুম, ঘুম, ঘুম, ঘুম, ঘুম। আকাশ ভ'রে ঘুম। খোকার তু-চোখে ঘুম। ঘুমো না রে খোকা, একটু চোখ বুজতেও কি পারিস না তুই?'

খোকার তুই নীল চোখ যেন আরো বড়ো হ'য়ে তাকিয়ে রইলো দিদির মুখে। 'চাঁদ কেন আকাশে থাকতে ভালোবাসে দিদি?'

'তোর আজ হ'লো কী, খোকা?—এমন অন্যায় আর দেখিনি, আজ রাত্রে যেন আর বাড়ি ফিরতে হবে না! বেড়াবার শখ থাকে ছেলেকে নিয়ে গেলেই হয়? আমার উপর কেন?—আকবরের ক-ছেলে ছিলো? নাঃ, এমন মুশকিল—'

'চাঁদ আসলে কী, দিদি? পরি?'

'তোর মুণ্ডু! এত কথা তুই বলতে পারিস! শোন, শো দেখি একটু চুপ ক'রে।' খোকার মাথা তার কাঁধের উপর রেখে তার তুটো হাত রান্নু নিজের গলায় জড়িয়ে নিলে। 'একটু চুপ ক'রে থাক। খোকার পায়ের উপর তু-হাত একত্র ক'রে রান্নু উঠে দাঁড়ালো। 'আয় আমরা একটু বেড়াই। গল্প শুনবি একটা?'

'গল্প বলো।'

'শোন—চুপ ক'রে শোন,' রান্নু ছাতে পাইচারি করতে লাগলো, 'মনে কর তোর আছে একটা ছোট্ট এরোপ্লেন—'

'হ্যাঁ, এলোপ্লেন!'

'এলোপ্লেন নয় রে, এরোপ্লেন। বল তো?'

'এলোপ্লেন।'

'তুই একটা বোকা। তোর সেই ছোট্ট, লাল এরোপ্লেনে চ'ড়ে—'

'লাল না, দিদি।'

'কী তবে?'

'সবুজ। আমার সবুজ এলোপ্লেন।'

'তোর সবুজ এরোপ্লেনে চ'ড়ে একদিন তুই উড়ছিস আকাশে—'

'পাখা দুটো সোনালি।'

'সোনালি পাখা চালিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে তোর সবুজ এরোপ্লেন, তুই ভিতরে ব'সে আছিস চাকা ধ'রে—'

'চাকাটা লাল।'

'ব'সে আছিস লাল চাকা ধ'রে। রোদ ঝিকমিক করছে সোনালি পাখায়। চারদিকে শুধু আকাশ, আকাশ, আকাশ ছাড়া আর-কিছু নেই—'

'নীল আকাশ।'

'নীল আকাশ নিচে ফেলে-ফেলে তুই উঠে যাচ্ছিস উপরে, তবু আকাশের শেষ নেই।'

'শাদা মেঘ।'

'শাদা মেঘ সব প'ড়ে আছে সে—ই কোথায়, অনেক নিচে। শোঁ-শোঁ ক'রে তুই চলেছিস ছুটে, হাওয়ার মতো জোরে, হাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি জোরে।'

'কোথায় যাচ্ছি?'

'যাচ্ছিস যেখানে খুশি। এখন তোর নিচে প্রকাণ্ড সমুদ্র, ঢেউয়ের ফেনায়-ফেনায় শাদা। লাফ দিয়ে-দিয়ে ঢেউগুলো উঠছে শূন্যে—কার উপর যেন ওদের রাগ। হঠাৎ সমুদ্র থেকে উঠে এলো এক কুয়াশা, নীল আকাশকে দিলে ঝাপসা ক'রে। কোনোদিকে কিছু আর দেখা যায় না। সোনালি পাখা অন্ধকারে ঝাপটাচ্ছে, সবুজ এরোপ্লেন কুয়াশায় মিশে গেলো। আর সেই সঙ্গে ঝড়—উঃ, কী ভীষণ ঝড়। সমুদ্রটা হাতির গায়ের মতো কালো, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে একশো হাজার হাতি দাপাদাপি করছে। লাল চাকা ধ'রে

তুই ব'সে আছিস। উঠে যাচ্ছিস আরো উপরে, যেখানে ঝড় নেই, নীল আকাশ যেখানে রোদে ভরা। কুয়াশার ভিতর দিয়ে তুই উঠছিস, আর-একটু পরেই ঝড় প'ড়ে থাকবে নিচে। এমন সময় হঠাৎ লাগলো ঝড়ের ঝাপটা, এত জোরে যে তোর সবুজ এরোপ্লেন গেলো উল্‌টিয়ে। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তুই পড়তে লাগলি।'

এই পর্যন্ত ব'লে রান্নু চুপ করলো। মুখ ঘুরিয়ে একবার তাকালো খোকার মুখে। খোকার শান্ত নীল চোখ ফিরে তাকালো তার দিকে।

'পড়তে, পড়তে, পড়তে, পড়তে,' সে আবার বলতে লাগলো, 'এরোপ্লেন যখন একেবারে সমুদ্রের কাছে এসে পড়েছে, তখন লাল চাকা ছেড়ে দিয়ে তুই জানলা দিয়ে দিলি এক লাফ। টুপ ক'রে ডুবে গেলি সমুদ্রের মধ্যে। ডুবছিস, ডুবছিস, ডুবছিস। এখানে ঝড় নেই, জল শান্ত আর সবুজ। আরো, আরো, আরো নিচে। এখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার, চারদিকে মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে, আলো-ঝলমল তাদের শরীর। আরো, আরো, আরো নিচে। সব আলো হ'য়ে গেছে—এত বেশি মাছ, আর এত আলো তাদের শরীরে! ডুবছিস, ডুবছিস, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, নিচে, আরো নিচে। কিন্তু সেখানে দিন নেই, রাত নেই, আজ নেই, কাল নেই, সেখানে দশটা বাজে না, সাড়ে-তিনটে বাজে না—সব সময় সেখানে এক সময়।'

রান্নু চুপ করলো; খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। খোকা একটুও নড়ছে না, তার মুখে টুঁ শব্দটি নেই। কিন্তু যেই রান্নু তার দিকে তাকালো, তার বড়ো-বড়ো নীল চোখের দৃষ্টি পড়লো এসে তার মুখের উপর।

'চল, খোকা, আমরা একটু শুই গে।' পাইচারি করতে-করতে রান্নুর ক্লান্ত লাগছিলো। খোকা কিছু বললে না; রান্নু তক্তাপোশের ধারে কাৎ হ'য়ে খোকাকে শোয়ালো তার পাশে। খোকার নীল চোখ জিজ্ঞাসায় চুপ ক'রে আছে।

'সমুদ্রের নিচের আর শেষ নেই,' রান্নু আবার বলতে আরম্ভ করলো, 'তুই ডুবছিস, ডুবছিস, ডুবছিস, ডুবছিস, ডুবছিস। এখানে আবার অন্ধকার—এমন অন্ধকার, যা কেউ কখনো ছাখেনি, পাথরের মতো জমাট অন্ধকার, অন্ধকার ছাড়া কোনোখানে কিছু নেই। চোখ বুজলেও যা, চোখ খোলা রাখলেও তা-ই। নিচে, আরো নিচে। আর হঠাৎ এক আলোর রাজ্য, বিদ্যুতের মতো আলোয় আলোময়, এত আলো যে চোখ মেলে রাখা যায় না। পায়ের নিচে তোর মাটি নয়, আলো। আর কত রকম রং! রামধনুর সঙ্গে রামধনু গা ঘেঁষে রয়েছে। এত আলো নিয়ে তুই কী করবি, খোকা?'

খোকা জবাব দিলো না।

'আলোর সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে,' থেমে-থেমে, একটানা সুরে রান্নু ব'লে যেতে লাগলো, 'রামধনু রঙের সব মাছ, ফুটে রয়েছে মুঠো-মুঠো মাছের মতো ফুল। চেনা যায় না, কোনটা মাছ আর কোনটা ফুল। এখানে আমরা কাটাচ্ছি দিন আর রাত, মাস আর বছর, হিন্দু রাজত্ব আর মোগল রাজত্ব; এখানে হ'য়ে যাচ্ছে অশোক, আকবর, আওরংজেব, ক্লাইভ—ওখানে কিছু নেই; আলোর মধ্যে সব মিশে গেছে, সব থেমে গেছে।...কিন্তু বল তো খোকা আকবর কোন সালে রাজা হন? জানিস খোকা, আকবর ছিলেন মস্ত বড়ো মোগল সম্রাট। কিন্তু, তোর যে আলোর আশ্চর্য রাজত্ব। তবু—বলতে পারিস, বলতে পারিস তারিখটা?...'

* * *

'ছাখো কাণ্ড রান্নুর, খোকাকে নিয়ে বাইরে প'ড়ে ঘুমোচ্ছে। ছেলেটার ঠাণ্ডা লাগবে, সে-খেয়ালও যদি থাকতো!'



ন-টা বেজে গেলো—মিন্নু এখনো ফিরছে না কেন? মেয়ে দিন-দিন ধিঙ্গি হচ্ছে, এখন পর্যন্ত একটু যদি বুদ্ধিশুদ্ধি হ'তো! স্কুল থেকে ফিরে কাপড়-চোপড় বদলেই সেই যে বেরিয়েছে—কত বললুম চুলটা বেঁধে যা, মেয়ের তর সইলো না। এক মাথা খোলা চুল নিয়েই উঠে বসলেন গাড়িতে—গাড়িটা দু-মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যেতো! ভারি এক বন্ধু জুটেছে অরু—কী মাথামুণ্ডু পার্টি না কী আছে, মেয়ে স্কুল থেকে ফিরতে-না-ফিরতেই গাড়ি এসে হাজির। তা গেছিস ভালো, সময়মতো ফিরতে হয় তো! অরুর বুদ্ধিকেও বলিহারি—পার্টি ব'লে সারা রাতই তো আর পার্টি নয়; বাড়ির লোক যে এদিকে ভেবে সারা···সকলের সঙ্গে তোরও ব'সে থাকবার দরকারটা কী?—বললেই হয়, আমার ভাই দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, আমি চললুম। না, আড্ডা পেলে মেয়ে সব ভুলে যায়। এত বয়স হ'লো—একটু কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত হ'লো না—ছাই লেখাপড়া শিখছে। ছাই স্কুল।···নাঃ,

সাড়ে ন-টা বাজতে চললো, একটা বিহিত করতে হয়। এই ভেন্টু, অরুদের বাড়িতে একটা টেলিফোন কর তো—এক্ষুনি যেন মিন্নু চ'লে আসে। কী বললি ? নম্বর জানিস নে ? দিনরাত তো টেলিফোন নিয়ে হ্যালো-হ্যালো করছিস—আর অরুদের নম্বর জানিসনে ? কতগুলো গোরু নিয়ে কি সংসার করা যায় ! একটু ছ্যাখ না বাপু—টেলিফোনের বইটা তো হাতের কাছেই রয়েছে ; টেরি বাগিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকলে তো আর ধুপ্ ক'রে নম্বর পড়বে না। কার নাম দেখতে হবে ? কার আবার, অরুর মামার। কী নাম ? কী নাম তা আমি কী ক'রে বলবো বাপু ? তোরাই তো জানিস। জানিস নে ? জানিসনে তো দিন-দিন ঢ্যাঙা হচ্ছিস কেন ? ছ্যাখ না, রায়চৌধুরী খুঁজলেই বেরিয়ে পড়বে। কী বললি, অরুর মামা কী ক'রে রায়চৌধুরী হবে ? কী হবে তাহ'লে ? তুই একটা—না, তা-ও তো বটে। ঠিকই তো, ঠিকই। অরুর মামা যেন কী ? কানুনগো, না দস্তিদার, না খাস্তগির, ঐ ধরনের কী একটা বিদঘুটে নাম যেন—নাঃ, জ্বালাতন আর কাকে বলে ! ভদ্রলোক একটা নামও বেছে নিয়েছেন চমৎকার ! এই বিন্নু, তুই জানিস অরুর মামার নাম ? হাঁ ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে আছিস কেন—কথা বল না ? না ? এ-কথাটা বলতে এতক্ষণ লাগে ? একটা কথা বলতে এতক্ষণ লাগে ? একটা কথা বলতে পারিস নে, এদিকে দস্যিপনা ক'রে বাড়ি মাথায় করবার বেলায় তো খুব ! এই ভেন্টু, তুই আবার টেলিফোনের বই ঘাঁটতে আরম্ভ করলি কেন ? কী পণ্ডিত ! নাম না-জানলে কি ম্যাজিকে নম্বর বেরিয়ে পড়বে ? নাঃ, তোদের যন্ত্রণায় আমি একদিন ঠিক পাগল হ'য়ে যাবো। যাবোই। নে, রাখ ওটা, কাজের কথা শোন। মিন্নুর ক্লাশের মেয়েরা—ওরা নিশ্চয়ই জানে অরুদের নম্বর। ওদের কাউকে জিগেস কর না। সুমিতা, অরুন্ধতী, বিভা, চামেলি—এদের যে-কোনো একজনকে জিগেস করলেই তো হয়। এ-কথাটা আগে মনে হ'লেই হ'তো—কেন এতক্ষণ আমাকে

বকালি? তুই কি প্রতিজ্ঞা করেছিস এক ফোঁটা বুদ্ধিও তোর মাথায় থাকতে দিবি না? নে, টেলিফোনটার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছিস কেন? তোলই না ওটা।

* * *

—আপনি সুমিতা রয়?

—Yes, who are you please?

—আমি মিন্নুর দাদা। আপনি অরুণা রায়চৌধুরীর টেলিফোন নম্বর বলতে পারেন?

—অরুণা রায়চৌধুরীর··· ? না। কিন্তু কেন বলুন তো?

—কি তার মামার নাম?

—ওর মামার নাম হচ্ছে···but I'm so sorry, কিছুতেই এখন মনে করতে পারছি না। What's the matter?···এখনো ফিরছে না? Oh, dear, dear! আর আমি যে এখন বেড-এ যাচ্ছি।

—আপনাকে বিরক্ত করলাম ব'লে দুঃখিত।

—Not at all. আমিও দুঃখিত, awfully sorry, খোঁজ দিতে পারলুম না। আপনাদের কারটা পাঠিয়ে দিন না।

—আপনি জানেন আমাদের গাড়ি নেই।

—Oh, sorry. কার একটা অভ্যাস হ'য়ে গেছে কিনা···তা এত ভাববারই বা কী হয়েছে? She'll be back in a jiffy··· well, bye-bye.

—বাই-বাই।

* * *

—আপনি মিন্নুর দাদা?

—হ্যাঁ। দেখুন—

—আপনার মা ভালো আছেন?

—হ্যাঁ, শুনুন—

—আর বিন্নু—ও কেমন আছে?

—সবাই ভালো। দেখুন, একটা ব্যাপার হয়েছে—

—মিন্নুর কোনো অসুখ করেনি তো? ও আজকে স্কুলে বলছিলো—

—না, না, মিন্নু স্কুল থেকে ফিরেই—

—কোনো অ্যাকসিডেন্ট?

—না। শুনুন, আপনি কি অরুণা রায়চৌধুরীর টেলিফোন-নম্বর, কি তার মামার নাম জানেন?

—অরুণার··· ? না, আমি তো জানিনে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার অবশ্য জানা উচিত ছিলো কিন্তু—

—আচ্ছা, এই জন্যেই—

—কিন্তু ব্যাপার কী? আমি কি আর-কিছু—

—না, না, ধন্যবাদ।

—আপনি ও আপনার মা আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন।

* * *

—কে?

—আমি মিন্নুর দাদা।

—বুঝতে পারছি না, ভালো ক'রে বলুন।

—আমি মিন্নুর দাদা।

—ও। কী দরকার?···না, আমি জানি না···আর কোনো কথা আছে?

—না, নমস্কার।

—নমস্—

* * *

—আপনি মিন্নুর দাদা? মিন্নু কোথায়?

—বাড়ি নেই। আপনি কি—

—মিন্নু এলে দয়া ক'রে ওকে একটা কথা বলবেন?

—বলুন।

—বলবেন, কাল ও যেন আমার জন্য এক জোড়া টেনিস শু স্কুলে নিয়ে আসে। একটু আগে হঠাৎ চোখে পড়লো আমার জোড়া ছিঁড়ে গেছে। বলবেন?

—বলবো। আচ্ছা, দেখুন—

—ওর দু-জোড়া আছে, কোনো অসুবিধে হবে না। আর, আমার আর ওর পায়ের মাপ একেবারে এক। কাল সকালে আর জুতো কেনার সময় থাকবে না, তাই—

—আচ্ছা, সে হবে। একটা কথা—

—মিন্নুকে কিন্তু টেনিসের পোশাকে চমৎকার দেখায়, তাই নয়? So smart. আমাদের মিস বিস্‌ওয়াস সেদিন বলছিলেন—

—বলতে পারেন—

—বলছিলেন, মিন্নু is a really nice girl. সত্যি তা-ই। আপনার তা-ই মনে হয় না?

—মিন্নু একটা ইডিয়ট।

—কী বললেন?

—মিন্নু একটা ইডিয়ট। হতচ্ছাড়া, পাজি—

—হঠাৎ পাগল হ'য়ে গেলেন নাকি?

—এখনো হইনি; তবে শিগগিরই হবো, আপনাদের মিন্নুর কল্যাণে।

—কেন, কী করেছে ও?

—ওর কথা আর বলবেন না। বাড়ির সবাইকে হাড়গোড়-সুদ্ধু জ্বালিয়ে খেলে। একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই—ফাজিল, স্টুপিড! একটা ছাগলও ওর তুলনায় উঁচুদরের জীব। ভারি তিনি একজন হয়েছেন—আড্ডা দেবেন আর ঘুরে বেড়াবেন—আর বাড়ির লোক তাকে মাথায় ক'রে নাচবে। ইডিয়ট, ইডিয়ট—

* * *

—কাকে তুমি অমন ক'রে গালাগাল দিচ্ছো, দাদা? আমার কোনো বন্ধুকে নয় তো? তোমার তো আবার কমনসেন্স নেই।

—এই যে, মিনু। এত দেরি হ'লো তোর? ছাড়তে চায় না? এদিকে রাত ক-টা বেজেছে খেয়াল আছে? তুই গান করছিলি? কোনটা? 'চৈত্র পবনে মম কুঞ্জবনে'—ওটা গাইতে গেলি কেন? ওটা তোর তেমন ভালো হয় না। 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' গাইলেই পারতিস। সবাই খুব প্রশংসা করছিলো তোর গানের? কে কে ছিলো? এদিকে আয় দেখি, শুনি। টেলিফোনটা রেখে দে না ভেন্টু, প্রাণপণে বিল তুলছিস—পয়সা তো আর তোকে দিতে হবে না!



নিরক্ষরতা দূর করো

হুপুরবেলা, সারা পাড়া যখন চুপচাপ, বাবা আপিশে, মা ঘুমিয়ে, ঠাকুমা কোণের ঘরটিতে কাঁথা শেলাইয়ে ব্যস্ত, মণ্টুর তখন সময়। টুকুর কথা কিছু বললুম না, কেননা তার বয়স মাত্র ছ-মাস; এখনো সে আদ্ধেক দিন দোলনায় শুয়ে গ্যাঁ-গ্যোঁ করে আর বুড়ো আঙুল চোষে। মণ্টু রীতিমতো বড়ো হ'য়ে গেছে—সামনের জন্মদিনে তার সাত বছর পুরবে।

বাড়িতে কারো যখন সাড়াশব্দ নেই, বেলা একটা-হুটোর মাঝামাঝি, তখন মণ্টু পা টিপে-টিপে বারান্দায় এলো। মা বলেছিলেন ঘুমোতে—রোজই বলেন—অনেকদিন জোর ক'রে চোখ বুজে শুয়ে-শুয়ে মণ্টুর চোখে ব্যথা হ'য়ে যায়। মা শুয়েই একটি বই খুলে ধরেন চোখের সামনে, খানিক পরেই তাঁর চোখ বুজে আসে, বই খ'সে পড়ে

হাত থেকে। চারটে পর্যন্ত মণ্টু নিশ্চিন্ত। দিনের বেলা প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোবার সময় কোথায় তার! কত কাজ!

বারান্দায় এসে মণ্টু ছাখে, ঠিক জায়গাটিতে মাছুরটি পাতা আছে, সেলেট পেনসিল আদর্শলিপিও আছে, নেই শুধু মানুষটি। ভারি রাগ হ'লো মণ্টুর। রোজ এ-সময়ে রামচরণকে সে লেখাপড়া শেখায়—আজ কোথায় গেলো সে? ও, আজ বুঝি কামাই করার মৎলব! একবার আস্থক না, দেবে শপাশপ কয়েক ঘা!

মণ্টু সিঁড়ির ধারে এদিক-ওদিক তাকালো। একবার ভাবলো, রাস্তায় নেমে বৈরাগীর পানের দোকানটা দেখে আসে—ওখানেই তো ওরা সব আড্ডা দেয়। কিন্তু মা-র কড়া হুকুম তার মনে পড়লো—কক্ষনো একা রাস্তায় যাবে না। তাই সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে লাগলো, (এ-বদভ্যাসটা তার কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না), আর মনে-মনে বৈরাগীর মুণ্ডপাত করতে লাগলো। ঐ লোকটার জন্যই পাড়ার চাকররা সব ব'য়ে যাচ্ছে—ছুপুরবেলা কোথায় ব'সে পড়াশুনো করবে তা তো নয়, দলে প'ড়ে তাস পেটানো!

মণ্টু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রাগে ফুলতে লাগলো।

কিন্তু একটু পরেই রামচরণকে দেখা গেলো রাস্তা পার হ'য়ে বাড়ির দিকে আসছে। তাকে দেখেই মণ্টু হাঁক দিলো 'এ-ই রামচরণ!'

'এই এলাম!'

রামচরণ কাছে আসতেই মণ্টু চড়া গলায় ব'লে উঠলো, 'কোথায় গিয়েছিলে? আজ পড়তে হবে না?'

রামচরণ মাথা চুলকিয়ে বললো, 'বেতটা ভেঙে গিয়েছিলো, তাই—'

'দেখি, এনেছো নতুন বেত?'

'হোঃ—সে কি এখানে! মজবুত একটা কচি ডাল জোগাড় করতে প্রায় লেকের ধারে চ'লে গিয়েছিলাম। তাইতে যা দেরি হ'লো।'

রামচরণের হাত থেকে নতুন বেতটা নিয়ে মণ্টু প্রথমে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখলো, তারপর হাওয়ায় শপাং শপাং ঘা দিলো কয়েকবার। খুব খুশি হ'লো মনে-মনে, কিন্তু সে জানে মাস্টার মশাইরা একবার চটলে সহজে আর খুশি হন না। তাই মুখে রাগি ভাবটাই বজায় রেখে বললো, 'আর দেরি না। বোসো গিয়ে নিজের জায়গায়।'

রামচরণ বারান্দায় উঠে তার ময়লা ছেঁড়া মাদুরটিতে গিয়ে বসলো। ছাত্র মাস্টারের বয়সের তফাৎ কম-সে-কম পঞ্চাশ বছর। রামচরণ বুড়োমানুষ। চোখের চামড়া কোঁকড়ানো ; মাথার চুল কালোর চেয়ে শাদাই বেশি। মাস্টার মশাইয়ের জন্য ছোট্ট জলচৌকি ঠিক জায়গায় পেতে দিয়ে রামচরণ বই খুলে বসলো।

মণ্টু কিন্তু বসলো না ; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে নতুন বেতটি দেখতে লাগলো। তারপর হঠাৎ এক ঘা বসিয়ে দিলো রামচরণের পিঠে।

'উঃ!'

'উঃ আবার কী! লেখাপড়া শিখতে হ'লে বেত খেতে হয় জানো না?'

'তা আর জানি না!'—একগাল হাসলো রামচরণ—'রোদ্দুরে ঘুরে এই কঞ্চিটি জোগাড় ক'রে আনলাম খামোকা বুঝি?'

মণ্টু গম্ভীরভাবে বললো, 'বেশ করেছো—ভালো করেছো।' চট ক'রে রামচরণের পিঠে ছোট্ট আর-এক ঘা বসিয়ে জিগেস করলে, 'কেমন বেত? লাগে?'

'খুব লাগে, খোকাবাবু!'

'এই! আবার খোকাবাবু! আমি মাস্টার মশাই না?'

'আজও কসুর হ'য়ে গেছে, মাস্টার মশাই, এবারটি মাপ করুন। মিছিমিছি আর মারবেন না মাস্টার মশাই ; আগে পড়া নিন, পড়ায় ভুল হোক, তখন মারবেন।'

মণ্টু জলচৌকিতে বসলো এবার। গলার আওয়াজ মোটা ক'রে বললো, 'বের করো পড়া। অ-জ আ-ম শেষ করেছো ?'

'এই যে ক-য়ে আকারে কা—'

মণ্টু মেঝেয় বেত ঠুকে বললো, 'নাঃ, কিচ্ছু হবে না তোমার। এতদিনে ক-খ পর্যন্ত শিখলে না ! কী উপায় হবে তোমার, রামচরণ ?'

'তা-ই তো ভাবছি, খোকা—মাস্টার মশাই, আমিও তো তা-ই ভাবছি। লেখাপড়া শেখার আগেই না ম'রেই যাই। বয়েস তো হ'লো।'

'কত বয়েস তোমার ?'

রামচরণ একটু ভেবে বললো, 'তা তিন কুড়ি হবে।'

'তিন কুড়ি ? ও, ষাট। ষাট কাকে বলে জানো না ?'

রামচরণ ঘোলাটে চোখ তুলে মিটিমিটি ক'রে তাকালো।

'একশো অবধি গুনতে শেখাতে হবে তোমাকে। উঃ, কী করেছো এতদিন—কিচ্ছু শেখোনি ?'

'এই তো এবারে শিখছি।'

'আচ্ছা দেখি কেমন শিখেছো।' আদর্শলিপির একটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে মণ্টু বললো, 'ঘ বের করো তো !'

প্রায় মিনিট খানেক পরে রামচরণ ম-এর উপরে আঙুল রেখে বললো, 'এই যে।'

'ছাই শিখেছো !' শপাং ক'রে পড়লো বেত।

'প বের করো।'

'এই যে প।'

'বেশ। এবারে ঠিক হয়েছে। আচ্ছা সেলেট পেনসিল নাও। লেখো তো—ফ ল।'

আঙুল কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে অনেক চেষ্টায় রামচরণ একটা বিশ্রী চেহারার ফ লিখলো। তারপর ল লিখতে যাবে—কিন্তু প্রথম

পুঁটলিটার উপরে পেনসিলটা কেবলই ঘুরতে লাগলো। সেখান থেকে আর যেন বেরোতেই পারবে না।

মাস্টারির গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে মণ্টু হেসে উঠলো।—'নাঃ, এখনো তোমার অনেক দেরি। ছাখো তো আমি কেমন লিখতে পারি!' পেনসিলটা নিয়ে মণ্টু লিখলো—ফল, জল, তরল, অনল।—দেখলে, কতগুলো কথা লিখলাম।

রামচরণ মুগ্ধ হ'য়ে মণ্টুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'বুড়ো হয়েছি—চোখে কিছু দেখতে পাইনে—আর কিছুদিন আগে আরম্ভ করলে মরবার আগে নিজের হাতে একখানা চিঠি লিখতে পারতাম ছেলেকে।'

মণ্টু বললো, 'আরো লিখবো? দেখবে?'

'হ্যাঁ, লিখুন।'

'তুমিই বলো কী লিখবো।'

'আমাদের গ্রামের নাম লিখুন।'

'কী তোমাদের গ্রামের নাম?'

'বিরিঞ্চিপুর।'

বি আর রি লিখে মণ্টু দেখলো ঞ-য় চ কী ক'রে লেখে ঠিক মনে পড়ছে না। ভারি বিশ্রী ওটা, যা-ই বলো। যাক গে, রামচরণ তো আর ওটা চেনে না, তাই সে আন্দাজি রকম গোটা কয় দাগ কেটে দিলো।

'এই ছাখো বিরিঞ্চিপুর লিখেছি।'

'আমার ছেলের নাম লিখুন—মদনেশ্বর পাল।'

'নাঃ, বাংলা আর না। জানো, আমি ইংরিজিও জানি। এই ছাখো B-A-T—bat। আদর্শলিপি হ'য়ে গেলে তোমাকে এ-বি-সি-ডি ধরাবো।'

রামচরণ রোমাঞ্চিত হ'য়ে বললো, 'এ জীবনে কি আর হবে! ক-খ-ই শিখতে পারলাম না এতদিনে!'

মণ্টু বললো, 'হ্যাঁ, এবারে তাড়াতাড়ি যা শেখার শিখে নাও। সামনের বছরে আমি স্কুলে ভর্তি হবো, জানো তো! তখন তো দুপুরবেলা তোমাকে পড়াতে পারবো না—এক সেই রবিবার। ততদিনে টুকুটা একটু বড়ো হবে—ওকেও তোমার সঙ্গে বসিয়ে দেবো —কী বলো?'

'কে খুকুমণি? খুকুমণি পড়তে শিখবে?'

'শিখবে না তো কি মুখ্যু হ'য়ে থাকবে নাকি? তুমি ভেবো না—এক মাসে হ'য়ে যাবে তোমার। আচ্ছা, এ-পাতাটা পড়ো তো!'

রামচরণ খুব মন দিয়ে দেখে-দেখে পড়তে লাগলো, 'অ-জ, জ-ল, ব-ন—' কিন্তু আর এগোতে পারলো না। এইটুকুতে তার চোখের আর মাথার এত পরিশ্রম হয় যে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়।

'তারপর?'

'ব-ব-ব-ব—এটা কী?'

'ড-এ শূন্য ড়। ব-ড়, বড়। বুঝেছো?'

একগাল হেসে রামচরণ বললো, 'ঠিক হয়েছে। তা পড়া আটকে গেলো, বেত তো মারলেন না।'

'বেশি মারতে নেই।'

'বেশি তো প্রথমেই দু-ঘা মেরে নিলেন। এখন ভুল করলাম, এখন বুঝি তাই ব'লে মারবেন না? ঐ যে একটা বাড়ি কম হ'লো, তাতে বিদ্যেও কম হবে—হবে না?'

'আচ্ছা, এই নাও।' মণ্টু আস্তে একটা বেতের বাড়ি দিয়ে বললো, 'আচ্ছা, এখন ব'সে-ব'সে পড়ো। একটা বেড়াল-ছানাকে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম দেখি সেটা আছে না পালিয়ে গেছে। ম্যাও ম্যাও ক'রে আবার মা-কে না জ্বালায়।'

মণ্টু উঠলো।

রামচরণ বললো, 'হেঁই খোকাবাবু, পায়ে পড়ি, এখনই যাবেন না। আমাকে খ-টা একটু লিখতে শিখিয়ে দিন—ওটা ভারি শক্ত।'

মণ্টু সেলেটের উল্টো পিঠে প্রকাণ্ড খ লিখে বললো, 'এটার উপর ব'সে-ব'সে মক্সো করো। আমি আসছি।'

বেত দোলাতে-দোলাতে মণ্টু চ'লে গেলো। রামচরণ খ-এর উপর দাগা বোলাতে লাগলো। হাত কাঁপে, চোখে ভালো দেখতে পায় না। ক-খ-প-চ-ছ-ত সব তার মাথার মধ্যে কিলবিল করতে থাকে। এত সে মনে রাখবে কী ক'রে? কতদিনে শিখবে? লিখতে শিখবে কতদিনে? একবার চোখ তুলে রোদে ভরা রাস্তার দিকে তাকায়, আবার খ-এর উপর মক্সো করে।

বেড়ালছানাকে মুক্তি দিয়ে এসে মণ্টু দেখে, তার ছাত্র সেলেটের উপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে।

পটাপট গোটাচারেক বেতের বাড়ি মেরে রামচরণকে জাগিয়ে তুললো।…'এই লেখাপড়া হচ্ছে—অ্যাঁ? প'ড়ে-প'ড়ে ঘুম?'

রামচরণ চোখ রগড়ে বললো, 'এই একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। খ-টা হ'য়ে গেছে—দেখবেন?'

'এখন আর দেখাতে হবে না। মা ডাকছেন, যাও—চায়ের জল চাপাও গে।'

রামচরণ একটুখানি হেসে বললো—'আজ রাত্তিরে ফুটপাতে ব'সে-ব'সে ঠিক ক'রে ফেলবো। কাল একটু শিগগির-শিগগির আসবেন।'

মণ্টু বললো, 'কাল তোমার ছুটি। কাল দুপুরে সিনেমায় যাচ্ছি বড়োমামার সঙ্গে।'

রামচরণ বললো, 'একটা দিন নষ্ট হ'লো৷ খোকাবাবু—আর ক-দিনই বা বাঁচবো!'



সকাল থেকে যুদ্ধের আয়োজন চলেছে।

দু-দিকে হাজার-হাজার সৈন্য কাতারে-কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে। একদিকে রাজা বিক্রমজিৎ ঝলমল চোখ-ঝলসানো পোশাকে আস্ত তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে, অন্যদিকে রানী সত্যবতী যেন চিকচিকে সবুজ ডাল-ছড়ানো নতুন দেবদারু। বিক্রমজিতের পিছনে তাঁর সেনাপতি, তার মাথায় জর্মান টুপি, ঘাড়ে সঙিন-উঁচোনো বন্দুক। আর আজকের এই ভীষণ যুদ্ধে নিজের প্রাণ দিয়ে সত্যবতীকে যে বাঁচাবে, তার পরনে বিলিতি ঘাঘরা, আর হাতে একটা ম্যাণ্ডোলিন। এমন যুদ্ধ হবে, যেমন কেউ কখনো ছাখেনি।

যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো ব'লে।

বিক্রমজিতের যে সেনাপতি, তার মাথায় জর্মান টুপি কেন? ঘাড়ে বন্দুকই বা এলো কেমন ক'রে? কেন হবে না, আর যে নেই! ছিলো বারোটা জলজ্যান্ত গটগটে সেপাই—ওঃ, কী ঝকঝকে দেখতে, মরতে-মরতে এই একটায় এসে ঠেকেছে। বাগানের কোণে

সারি-সারি তাদের এগারোটা কবর ; মণ্টু নিজের হাতে তাদের উপর মাটি চাপা দিয়েছে, তারা খৃস্টান কিনা। তা হোক ; যে একজন আছে সে একাই বারো, সে-ই হচ্ছে গিয়ে জাঁদরেল কমাণ্ডার, হাজার যুদ্ধের ঝড়-ঝাপটে এখনো টিঁকে আছে পাহাড়ের মতো। সে থাকতে মণ্টুর ভয় নেই।

আর রানী সত্যবতীর পাশে মেমসাহেব কেন? বাঃ, কেন হবে না? মিনুর আর-সব পুতুল খায়-দায় ঘরকন্না করে, এই ম্যাণ্ডোলিন-মেম চায় যুদ্ধ। ছুটে এলো সে ঘাঘরা লুটিয়ে, চুল ঢুলিয়ে যেই ডাক পড়লো যুদ্ধে, হাজার কালো ঘোড়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাতের ম্যাণ্ডোলিন বাজে না ; আসলে ওটা যে ভয়ংকর অস্ত্র, সাধ্য কি তার সামনে শত্রুপক্ষের সৈন্য এগোতে পারে।

দু-দিকের সৈন্য-সংখ্যাই ঠিক দশ অক্ষৌহিণী। তাদের দেখা যায় না চোখে, যায় না শোনা কানে, তাদের শুধু ধ'রে নিতে হয়। ঠিক দশ অক্ষৌহিণী—দু-দিকে একজনও বেশি নয়, একজন কমও নয়।

মাঝখানে একটা গোল টেবিল, সেটা দু-রাজ্যের সীমানা, নাম তার মালাবার পাহাড়। সেই পাহাড়ের শত-স্মৃতি-জড়িত উপত্যকায় আজ এই ইতিহাসের স্মরণীয় দিনে দু-পক্ষে দেখা।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'সত্যবতী, তোমার স্পর্ধা আমি অনেক সহ্য করেছি। তুমি অবলা নারী, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। যদি নিজের ও প্রজাদের কল্যাণ চাও, তোমার ঐ ক্ষুদ্র রাজ্য দাও আমার হাতে ছেড়ে ; সূর্যবিজয়ের বংশধরকে সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'রে তোমার বর্বর জনপদ ধন্য হোক।'

রানী সত্যবতী উত্তর দিলেন, 'ধিক্ তোমাকে বিক্রমজিৎ, যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে এখন কাপুরুষের মতো শান্তির প্রস্তাব করছো! যাকে অবলা বলছো, দ্যাখো তার বাহুতে কত শক্তি। রানী সত্যবতী স্বয়ং সেকেন্দর সম্রাটকে সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়েনি, তোমার মতো শৃগালকে সে ভয় করে না।'

তারপর অবশ্যি যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো।

বাপ্‌রে, কী যুদ্ধ! কোটি-কোটি তীরে আকাশ অন্ধকার; জর্মান জাঁদরেলের বন্দুকে আর মেমসাহেবের ম্যাণ্ডোলিন-রূপী অস্ত্রে ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো ঘুরপাক খেয়ে-খেয়ে উড়ছে কত অযুত সৈন্যের প্রাণ-পুরুষ। যুদ্ধের দাপটে স্বয়ং মালাবার পাহাড় ন'ড়ে উঠলো।

পাহাড় পার হ'য়ে বিক্রমজিৎ প্রায় সত্যবতীর রাজ্যে প্রবেশ করতে যাবেন, ঠিক এমনি সময় পিছন থেকে তীব্র একটা ডাক শোনা গেলো:

'মণ্টু!'

রাজা বিক্রমজিৎ চমকে উঠলেন। গোল টেবিলটা ছিলো তাঁর দুই প্রসারিত পায়ের মাঝখানে, তাড়াতাড়ি সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে গিয়ে মালাবার পাহাড় কাৎ হ'য়ে পড়লো।

মা আবার ডাকলেন, 'মণ্টু!'

মণ্টু দু-পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে চুপ ক'রে রইলো।

'জিনিশ-পত্র নিয়ে এ কী দস্যিপনা তোদের! টেবিল ছাড়া কি খেলা হয় না?'

মিনু বললো, 'ওটা টেবিল না, মা, ওটা পাহাড়।'

মা বললেন, 'তা পাহাড়ই বলা উচিত, নয় তো এখনো টিঁকে আছে। মণ্টু চুল ছাঁটবি আয়। শশী এসেছে।'

বীরশ্রেষ্ঠ বিক্রমজিতের মুখ শুকিয়ে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো।

'আয় শিগগির। শশী কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে তোর জন্য?'

মণ্টু বললো, 'আমার চুল তো এখনো বড়ো হয়নি, মা।'

'না, তা কি আর হয়েছে। পিছন দিয়ে বাছুরের লেজের মতো ঝুঁটি নেমেছে, এই যা। আয়।'

মণ্টু ভিতরে-ভিতরে একবার কেঁপে উঠে বললো, 'আজ বড়ো শীত, মা।'

'শীত তা হয়েছে কী? গরম জলে সাবান দিয়ে সুন্দর স্নান করবি। কত ভালো লাগবে, দেখিস।'

ঐ সাবান জিনিশটার নাম শুনে মণ্টুর হাত-পা প্রায় খ'সে পড়লো। যেন কোনো নামহীন বিকট ভয়ের সামনে সে দাঁড়িয়েছে, দু-হাত দিয়ে চোখ দুটো সে চেপে ধরলো শক্ত ক'রে।

মা গোল টেবিলটা তুলে ঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে বললেন, 'আয়।' এমনভাবে বললেন যে তার উপরে আর কথা চলে না।

মণ্টু অস্ফুট গলায় বললো, 'যাচ্ছি মা, তুমি যাও।'

'দেরি করিস না কিন্তু। আজ না-হ'লে আবার এর পরের রোববার।'

এ-কথা ব'লে মা চ'লে গেলেন ব্যস্তভাবে।

আজ রবিবার। বিধাতা কত আশা ক'রে একটি দিনকে বানিয়েছিলেন। আজ নাবার সময় হয় না, খাওয়ার সময় হয় না, আজ হয় না স্কুলের বেলা। আর আজকের দিনটাকে মুহূর্তে ছারখার ক'রে দিলো এই দস্যু, এই দানো, এই দুষমন শশী নাপিত।

মণ্টু বললো, 'সত্যবতী, আজ তাহ'লে যুদ্ধ স্থগিত রইলো।'

মিন্নু বললো, 'আমার পক্ষের তিন অক্ষৌহিণী সেনা এরই মধ্যে নিহত। ধন্য যোদ্ধা তুমি, বিক্রমজিৎ!'

মণ্টু বললো, 'সত্যবতী, তোমার শৌর্যে আমি মুগ্ধ। আর কেউ পারতো না এত অল্প সময়ে আমার তিন অক্ষৌহিণী সেনা নিপাত করতে।' তারপর অন্য রকম সুরে বললো, 'তোদের কী মজা, মিন্নু, চুল ছাঁটবার জ্বালা নেই।'

মিন্নু বললো 'কী যে বলিস! এই আঁচড়াও, এই বুরুশ করো, এই ফিতে বাঁধো, মাথা ঘষো—কী উৎপাত ভেবে দ্যাখ তো। তোদের কী, মাসে একবার একটু কষ্ট।'

মণ্টু তুলনাটা মনে-মনে একটু ভেবে দেখে বললো, 'তা ঐ শশীর

খপ্পরে পড়ার চাইতে তাও ভালো। আচ্ছা, কী হয় চুল না-ছাঁটলে বল তো? চুল না-ছাঁটলে মানুষ ম'রে যায়?'

মিনু বললো, 'মা-রা ঐ রকমই। কিচ্ছু বোঝেন না।'

ঐ তো শশী নাপিত, বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। মস্ত কালো বিদ্ঘুটে দানো একটা, এক ফোঁটা দয়ামায়া নেই। বগলে ওর পুঁটলিতে কত ভয়ানক সব যন্ত্রপাতি, তা দিয়ে ছোটো ছেলেদের ও কষ্ট দেয় যত পারে, দিব্যি হাসেও আবার।

তাই ব'লে মণ্টু কি ভয় পাবে? অমন ছেলেই সে নয়। দিয়েছে সে মাথা পেতে শশী নাপিতের কাছে, চোখ বুজেছে শক্ত ক'রে, আঁকড়ে রয়েছে হাতের মুঠি, ঠোঁটে ঠোঁট রয়েছে চেপে।

কচ্—কচ্, কচ্—কচ্—কচ্, কচ্—কচ্, কচ্—কচ্—কচ্—কচ্—কচ্, কচ্! চলেছে শশীর কাঁচি. মণ্টু রয়েছে শক্ত হ'য়ে—চোখ মেলে না, পাছে চোখের মধ্যে চুল উড়ে পড়ে। চোখে চুল গেলে অন্ধ হ'য়ে যায় কিনা!

—'আহা, চুপ ক'রে থাকো না, অত নড়লে চলে!'

ফেরো এদিক, ফেরো ওদিক, থাকো এমনি, থাকো অমনি।—ঘাড় তো টনটন ক'রে ছিঁড়ে পড়লো। তা পড়লোই বা, একবার যখন বাগে পেয়েছে তখন শশী নাপিত কি আর ছাড়বে! আহা—চুল বড়ো হয়েছে, ছোটো করতে হবে তো? দু-মিনিটে কচকচ ক'রে কেটে দিলেই হয়। তা তো নয়, আধ ঘণ্টা ব'সে-ব'সে ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে—উহু-হু! খোঁচা লাগে না বুঝি! তলোয়ার দিয়ে শশী নাপিতের পেটটা ফাঁসিয়ে দিলে কেমন হয়? ঐ রে, আবার বুঝি কানের কাছে এলো। শুড়শুড়িতে ম'রে গেলেও চুপ ক'রে থাকে নাকি মানুষ? সারা গায়ের কুটকুটিতে ম'রে যাবার জোগাড়। শশীকে আলপিনের বিছানায় কেউ শুইয়ে রাখতে পারে না?

এতক্ষণে শেষ হ'লো। এতক্ষণে চোখ মেলে তাকিয়ে মণ্টু আবার দেখলো তাদের বাগানের গাঁদা ফুল, দেখলো রাস্তায় একটা

ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে, দেখলো ছুটো বেড়াল-ছানা রোদ্দুরে খেলা করছে। আর দেখলো মা দাঁড়িয়ে, স্বহস্তে সাবান তোয়ালে নিয়ে। হঠাৎ দিশেহারা হ'য়ে মণ্টু দিলো দৌড়, কিন্তু মা খপ ক'রে তাকে ধ'রে ফেললেন পিছন থেকে।

'গা-ময় চুল নিয়ে আর ছুটোছুটি করতে হবে না। এখন নাইতে হবে।'

ছুঃসময় যখন আসে তখন এমনি। মা গো, বাথরুমটা কী ঠাণ্ডা! মণ্টুর হাত-পা অসাড়। মণ্টু আর নেই, মণ্টু ম'রে গেছে। মা-র ছুই হাত ছুই সর্বনেশে তলোয়ারের মতো তাকে ঘিরে ফেলেছে। এই তেল, এই জল, এই তোয়ালে, এই সাবান—বিছ্যুতের মতো খেলছে তলোয়ার। মাথায় ফেনা, গায়ে ফেনা, গায়ে-মাথায় জলের বৃষ্টি। উহু-হু। মণ্টুর দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠকিয়ে উঠলো। মণ্টু একটা আগুন-লাগা বাড়ি, ফায়ার-ব্রিগেড তার উপর জল ঢালছে। উহু-হু-হু!

মণ্টু চীৎকার করছে, প্রাণপণে চোখ বুজে হাত-পা ছুঁড়ছে—গেলো রে গেলো, চোখে সাবান গেলো তার। ঐ সাবান ব্যাপারটা এমন বদ, যেমন ক'রে পারে তার চোখে যাবেই। সে তো চোখ বুজে আছে কখন থেকেই।

'ম্-মা—মাগো—আর—ন্না—উহু—হু—'

'চুপ কর। এত বড়ো ছেলে, চ্যাচাতে লজ্জা করে না?'

স্নান হ'য়ে গেছে। ধোপাবাড়ির ইজের আর ফতুয়া প'রে মণ্টু কাঁপতে-কাঁপতে বাগানে এসে দাঁড়িয়েছে। বাগানে রোদ, বাগানে রং-বেরঙের গাঁদা, বাগানে ফুটফুটে ছুটো বেড়ালছানা খেলা করছে। মণ্টু তাকিয়ে দেখলো, মণ্টুর ভালো লাগলো। এখন সবই ভালো। এখন আর কোনো ভয় নেই। বদ বিশ্রী বিদঘুটে বিকট যত কিছু সব হ'য়ে গেছে শেষ। শেষ হয়েছে সব। এখন নিশ্চিন্ত, এখন শান্তি। গাঁদাফুলগুলো জ্বলছে নানা রঙের ছোটো-ছোটো আগুনের মতো—বাঃ, প্রকাণ্ড একটা সূর্যমুখীও ফুটেছে যে! মণ্টু দৌড়ে দেখতে গেলো।



প্রথম দুঃখ

'বাবা ! ও বাবা !'

'উঁ।'

'তোমার কাঁচিটা একটু দেবে ?'

'কাঁচি দিয়ে কী হবে ?'

'দাও না একটু।'

'না। এই টেবিলের ছুরি কাঁচি আঠার শিশি কিচ্ছুতে আর হাত দিতে পারবে না। ও-সব আমার কাজের।'

'আমার একটা কাজ আছে, বাবা।'

'টুনি ! এখান থেকে যাও। আমি লিখছি।'

অগত্যা টুনি বললো, 'তাহ'লে তোমার অ্যাশটেগুলো দাও, মেজে আনি।'

'অ্যাশটে বলে না, অ্যাশট্রে।'

'ও, হ্যাঁ—অ্যাশট্রে। আমি তো অ্যাশট্রেই বলি আজকাল। ছেলেবেলায় ট্রামকে টাম বলতাম, না বাবা ?'

'টুনি ! তুমি কি কথাই বলবে এখানে দাঁড়িয়ে ?'

'না বাবা, অ্যাশট্রেগুলো নিয়েই চ'লে যাবো,' হাত বাড়িয়ে টুনি একটা-একটা ক'রে কাছে টানতে লাগলো। 'ঈশ, কী ময়লাই হয়েছে! একেবারে ঝকঝকে ক'রে আনবো, কেমন বাবা?'

'টুনি, তুমি কি এ-ই করবে সারা দিন? একটুও পড়বে না?'

'না, বাবা, পড়তে আমার ভালো লাগে না।'

'তাহ'লে আমার সেক্রেটারি হবে না তুমি?'

'তোমার সেক্রেটারি তো দিদি হবে। দিদিকেই তো তুমি প্রুফ দেখতে দাও।'

'বেশ তো, তুমিও প্রুফ দেখো; ভালো ক'রে বানান-টানান শিখে নাও চটপট।'

'না বাবা, ও-সব দিদিই করুক।'

'আর তুমি?'

'আমি বাসন-টাসন মাজবো আর তোমাকে চা ক'রে দেবো যতবার চাও। রোজ তিনটের সময় তোমাকে চা ক'রে দিই না?'

'বাঃ! তুমি না-দিলে চা খাওয়াই হয় না আমার!'

'কী ক'রে হবে! কালী ঘুমিয়ে থাকে, কাঞ্চা বেরিয়ে যায়, মানকুমারীকে ডেকেই পাওয়া যায় না, আর মা—মা-ও ঘুমিয়ে থাকেন। তোমাকে যে চা দিতে হবে সে-কথা কেউ ভাবেই না।'

'ভাগ্যিশ ভাবে না! আর কেউ চা করলে ভালোই হয় না তোমার মতো!'

'এখন খাবে, বাবা? আনবো চা করে?'

'এখন না, তিনটে তো বাজেনি এখনো—'

'ও! তাহ'লে এগুলো এখন মাজি গিয়ে, খুব ভালো ক'রে মাজবো তো—ততক্ষণে তিনটে বেজে যাবে।—ও মা! এই যে সেই থালাটা!'

'আর না টুনি, এখন যাও।'

'আমি ভেবেছিলাম ওটা হারিয়ে গেছে! কী সুন্দর! এটা আমাকে দিয়েছিলো, না বাবা?'

'তুমি চেয়ে নিয়েছিলে।'

'মোটেও না! আমাকে দিয়েছিলো। সেই শান্তিনিকেতনে, না? কে না দিয়েছিলো, বাবা? কী দেবী?'

'তপতী দেবী দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তপতী দেবী। কী সুন্দর দেখতে তপতী দেবী, আর কী সুন্দর বাড়িটা। আর কত বড়ো একটা কুকুর! কেন দিয়েছিলো, বাবা?'

'দিয়েছিলো বলে না, দিয়েছিলেন।'

'ও, হ্যাঁ—ভুলেই যাই। কেন দিয়েছিলেন?'

'চা খাবার পরে ওতে মশলা দিয়েছিলেন আমাদের, তুমি হাতে নিয়ে আর দিতে চাইলে না, তাই উনি তোমাকে দিয়ে দিলেন। ও তো একরকম চেয়েই আনা!'

'মোটেও না! আমি কক্‌খনো চাইনি! আচ্ছা বাবা, তপতী দেবীর মনে আছে থালাটার কথা?'

'যে দেয় তার কি মনে থাকে!'

'থাকে না, না? কিন্তু দেখলে তো মনে পড়বে?'

'তা হয়তো—'

'তপতী দেবী আমাদের এখানে এলে কী মজা হয়! বেশ আমরাও ওতে ক'রে মশলা দিতে পারি ওকে।'

'ওকে বলতে হয় না, ওঁকে।'

'দেখলে তো চিনবেন যে ওঁরই থালা, আর কী-রকম অবাক লাগবে তখন! বাবা, তপতী দেবীকে একদিন আসতে বলো।'

'উনি তো শান্তিনিকেতনেই থাকেন—'

'কোনোদি—ন কলকাতায় আসেন না?'

'আসেন মাঝে-মাঝে।'

'এলে একদিন বোলো, বোলো কিন্তু! বলবে তো?'

'বলবো।'

'যাই এখন, তোমার অ্যাশট্রে মাজি গে। ঠিক তিনটের সময় চা দেবো তো?' ব'লেই বারান্দার তুলসীর টব থেকে মাটি নিয়ে টুনি সবেগে অ্যাশট্রে মাজতে ব'সে গেলো, আর তার বিদ্বান বাপ এতক্ষণে রেহাই পেয়ে ডিকশনারি খুলে শক্ত-শক্ত কথা খুঁজতে লাগলেন লেখার মধ্যে বসাবার জন্য।

* * *

বিকেলবেলা টুনি বললে সুমিকে, 'দিদি শোনো—জানো, একটা মজা!'

'কী হয়েছে?'

'সেই থালাটা খুঁজে পেয়েছি আজ, জানো না!'

'থালা!'

'হুঁ-উ, সেই পততি দেবীর থালা—সেই যে শান্তিনিকেতনে—মনে নেই তোমার—'

'ও-ও, তপতী দেবী!'

'কী সুন্দর ছোট্ট থালাটা আমাকে দিয়েছিলো—মানে, দিয়েছিলেন—সেটা খুঁজে পেয়েছি, জানো! তপতী দেবী এলে ওতে মশলা দেবো—কী মজা হবে তখন!'

'এ আবার একটা মজা কী!'

'তপতী দেবীর তো আর মনে নেই থালাটার কথা, দেখে কী-রকম অবাক লাগবে বলো তো?'

'কেন, অবাক কেন?'

'বা রে! ওঁর থালাতেই ওঁকে মশলা দেবো—উনি তো ভাবতেও পারবেন না সে-কথা!'

'টুনিটা কী রে!' ব'লে তার পাঁচ বছরের বড়ো দিদি বেণী দুলিয়ে চ'লে গেলো বন্ধুর বাড়িতে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র রিহার্সেলে।

সন্ধেবেলা মা-র কাছে এসে টুনি বললে, 'মা, একটা কথা শুনবে—রাগ করবে না তো?'

'কী—বল না ?'

'তপতী দেবীকে একবার আসতে বলবে, মা ?'

'তপতী-দি আবার কে ?'

'তপতী-দি না, তপতী দেবী। শান্তিনিকেতনের তপতী দেবী। একবার বলবে আসতে ?'

'কেন, শুনি ?'

'তপতী দেবী আমাকে একটা থালা দিয়েছিলেন—সেটা তো হারিয়ে গিয়েছিলো—মানে, সত্যি হারায়নি, আমি ভেবেছিলাম হারিয়ে গেছে, কিন্তু আজ খুঁজে পেয়েছি বাবার টেবিলে ডিকশেনারির তলায়। তপতী দেবী এলে না—আমি না—সেইটে ক'রে মশলা দেবো—কী মজা হবে, না, মা !'

'ভারি মজা তো !' ব'লে মা উঠে গেলেন রান্নার তদারক করতে।

টুনি মা-র পিছনে-পিছনে গিয়ে বললো, 'বলবে, মা, আসতে ?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, বলবো—'

'একটা চিঠি লিখে দাও না এখনই—'

'তোর বাবাকে বল গিয়ে—' ব'লে মা বঁটি পেতে চালকুমড়ো কাটতে ব'সে গেলেন।

বাবামশাই টেবিল-ল্যাম্পো জ্বেলে তখনও লেখার উপর ঝুঁকে, সারাদিনে তাঁর পণ্ডিতি লেখার মাত্রই দু-পাতা এগিয়েছে। টুনি এসে খুব নরম গলায় ডাকলো, 'বাবা !'

'উঁ।'

'কী লিখছো, বাবা ?' এবার একটু গলা চড়লো টুনির। 'কী লিখছো—গল্প, না কবিতা ? ছোটোদের, না বড়োদের ?'

'গল্পও না, কবিতাও না, প্রবন্ধ।'

'প্র-বন্ধ কী, বাবা ?'

'যা ছোটো-বড়ো কেউই পড়ে না, তাকেই বলে প্রবন্ধ।'

'ও—ও! তার মানে তুমি কিছুই লিখছো না! তাহ'লে তো তুমি একটা চিঠিও লিখতে পারো, বাবা।'

'খুব পারি।'

'তপতী দেবীকে একটা চিঠি লিখে দাও না, বাবা, একদিন আসতে লিখে দাও। এখনই লেখো।'

কথার সঙ্গে কুস্তি ক'রে-ক'রে হয়রান হ'য়ে গিয়েছিলেন বাবামশাই, লেখার বড়ো কাগজ সরিয়ে, চিঠির ছোটো কাগজ টেনে নিয়ে বললেন, 'কী লিখবো বলো।'

'বললাম তো আসতে লেখো—আবার কী! লিখে টিকিট লাগিয়ে রেখে দাও, কাল সকালে উঠেই আমি ডাকে দিয়ে আসবো। আর-কাউকে দিয়ো না কিন্তু ডাকে দিতে!'

প্রবন্ধ লেখায় ক্লান্ত হ'য়ে টুনির বাবা সত্যিই একখানা চিঠি লিখে ফেললেন তপতী দেবীকে, আর সে চিঠি পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে চোখ খুলেই টুনি দিয়ে এলো রাস্তার ডাকবাক্সে। তারপর বারান্দার রেলিং ধ'রে লাফাতে-লাফাতে একা-একাই চ্যাঁচাতে লাগলো; 'কী মজা! কী মজা! কী মজা!'

* * *

টুনি ভেবেছিলো চিঠি পাবার সঙ্গে-সঙ্গেই তপতী দেবী চ'লে আসবেন—কিন্তু না! একদিন-একদিন ক'রে কতদিন কেটে গেলো, কে কোথায়! থালাটি মেজে-মেজে আয়নার মতো ক'রে তুললো টুনি; বাবার টেবিলে রাখলে বাবা ওতে সিগারেটের ছাই ফেলবেন নিশ্চয়ই, মা-র ড্রেসিং টেবিলে রাখলে সিঁদুর-টিদুর লেগে নষ্ট হবে, তাই একেবারে লুকিয়ে ফেললো খাটের জাজিমের তলায়। 'তপতী দেবী কবে আসবেন?' এ-কথা জিগেস ক'রে-ক'রে মা-র তাড়া খেলো সে, বাবার মুখে 'আসবেন একদিন' ছাড়া আর-কিছু শুনলো না, আর দিদি—দিদিকে বলতে গেলেই এমন কলকল ক'রে হাসে যে রীতিমতো ঘেন্না ধ'রে গেলো টুনির। মাঝে-মাঝে থালাটি

বের ক'রে নাড়া-চাড়া ক'রে ছাখে, আর কোনো চুপচাপ বেকার দুপুরবেলায় কি বৃষ্টি-পড়া বিকেলে জানলার ধারে ব'সে-ব'সে বলে, 'দূর ছাই, কিচ্ছু ভালো লাগে না, তপতী দেবী কেন আসে না!' আপন মনেই বলে, আর-কেউ শোনে না সে-কথা।

এক বছর কেটে গেলো। ইতিমধ্যে কলকাতার রাস্তায় ট্র্যাম পুড়লো, গুলি চললো, কত মানুষ লরি-চাপা পড়লো, আর টুনির মাথা বাবার টেবিল ছাড়ালো, আর সেই থালাটি আরো দু-বার হারিয়ে আরো দু-বার খুঁজে পাওয়া গেলো। তারপর একদিন টুনি যখন শুয়ে-শুয়ে হাত-পা নেড়ে রবীন্দ্রনাথের রেকর্ডে-শোনা 'বীরপুরুষ' কবিতা আওড়াচ্ছে, হঠাৎ মা-বাবার কথার মধ্যে তপতী দেবীর নাম শুনে সে, 'হা-রে-রে-রে-রে' বলতে-বলতে থেমে গেলো। হাত-পা নড়া বন্ধ হ'লো তার, চোখ দুটি স্থির হ'লো, তারপর আর থাকতে না-পেরে উঠে ব'সে বললো, 'সত্যি নাকি বাবা?'

'কী?'

'তপতী দেবী কাল আসবেন?'

বাপ বললেন, 'হ্যাঁ টুনি, তোমার তপতী-তপস্যা সার্থক হ'লো এতদিনে।'

মা বললেন, 'কী অতটুকু মেয়ের মুখে তপতী দেবী! মাসিমা বলতে পারো না! কাল এলে মাসিমা বোলো, বুঝলে?'

টুনি আর কিছু বললো না, লাফালো না, চ্যাঁচালো না; বালিশে মুখ ঢেকে উপুড় হ'য়ে শুয়ে মাথাটি একবার এ-কাৎ একবার ও-কাৎ করতে লাগলো, বুকের ভিতর থেকে তার সমস্ত ছোট্ট শরীরটিতে সুখের একটা শিরশিরানি যেন ঘুমের মধ্যেও থামলো না।

* * *

পরদিন দুপুরবেলা বারান্দার রোদ্দুরে ব'সে-ব'সে সে থালাটি মেজে-মেজে এমন ক'রে ফেললো যে মুখ দেখা যায়। মা-র পান সাজবার ডালাটা তোলা ছিলো বাবার বইয়ের আলমারির মাথায়—

হাতের কাছে পেলে দুই মেয়েই কুটুরকুটুর ক'রে বড্ড মশলা খায় কিনা—টুনি একবার দেখে নিলো মা বেশ ঘুমুচ্ছেন, তারপর একটা চেয়ার ঠেলে-ঠেলে আলমারির কাছে নিয়ে তার উপর দাঁড়ালো, তবু ভালো ক'রে হাত পায় না—কসরৎ ক'রে হাত বাড়িয়ে-বাড়িয়ে তুলে আনলো কয়েকটি লবঙ্গ, এলাচ, সরু ক'রে কাটা একটু শুপুরি, সব শেষে মাত্রই এক মুঠো ভাজা মৌরি মুখে পুরে নেমে এলো, থালাটিতে সাজালো শুপুরি, লবঙ্গ, এলাচ, ভাঙা কাচের ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে রেখে দিলো ঐ আলমারিরই নিচের তাকে বড়ো-বড়ো শোওয়ানো বইয়ের উপরে, পাৎলা একখানা বই দিয়ে ঢেকেও দিলো। চেয়ারটা ঠেলে-ঠেলে সরিয়ে নিয়ে গেলো ঠিক জায়গায়, তারপর পাটি-বিছোনো খাটে মা-র পায়ের কাছে গড়াতে-গড়াতে কখন স্থির হ'লো, কখন ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখলো ঘরে কেউ নেই, আর বসবার ঘর থেকে যেন চায়ের টুংটাং আওয়াজ আসছে। হাওয়ার মতো ছুটলো সেদিকে, কিন্তু ঘরে ঢুকলো না, দরজার পরদা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলো, পরদাটা দাঁতে চিবোতে গিয়েই মা-র বকুনি মনে ক'রে থেমে গেলো। ধবধবে শাদা কাপড় প'রে ধবধবে রং নিয়ে তপতী দেবী ব'সে আছেন, তাঁর পাশে ব'সে চা ঢালছেন মা, বাবা অন্য একটা চেয়ারে ব'সে কবিতা-টবিতার কথা বলছেন, আর দিদিও একলা একটা চেয়ারে শাড়ি প'রে ব'সে একটু-একটু তাকাচ্ছে, আর একটু-একটু নখ কামড়াচ্ছে। টুনি দু-বার স'রে এসে আর-একবার মুখ বাড়ালো।

তপতী দেবী তাকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন. 'আরে এসো, এসো, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

এক পা দু-পা ক'রে এগোলো টুনি।

হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে তপতী দেবী বললেন, 'আমাকে মনে আছে তোমার? মনে আছে শান্তিনিকেতনের কথা?'

'মনে আছে মানে! আপনার নামই তো দিবারাত্র জপছে।—তা কবিতার এই অধঃপতনের আসল কারণটা—'

টুনির বিদ্বান বাবা স্যাণ্ডউইচ খেতে-খেতে কবিতার অধঃপতনের কারণ দেখাতে লাগলেন, আর টুনি লাল হ'য়ে, ঘেমে, হাতে হাত ঘ'ষে কেমন যেন বিহ্বল হ'য়ে পড়লো।

'তুমি কিছু খাবে না?' ব'লে তপতী দেবী তার হাতে এক টুকরো কেক দিতে যাচ্ছিলেন, মা গম্ভীর গলায় বললেন, 'টুনি, যাও, চোখ-মুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে ভালো জামা প'রে এসো।'

'আহা, থাক না—কী মিষ্টি দেখাচ্ছে ঘুম-ভাঙা চোখে!' তপতী দেবী এ-কথা বললেন, কিন্তু হাত সরিয়ে আনলেন কাঁধের উপর,থেকে। ছাড়া পেয়ে টুনি দৌড়ে পালালো।

ফিটফাট হ'তে অনেকটা সময় গেলো তার। তার কারণ, প্রত্যেকটা কাজে তার খাটুনি বেশি; বাথরুমের কল সে হাতে পায় না, ড্রেসিং-টেবিলের চেয়ারে উঠে হাঁটু ভেঙে বসলে তবে তার মুখের ঠিক ছায়া পড়ে, চুল তার এত ঘন যে মাথা আঁচড়ানো তার বিভীষিকা, ফ্রকের পিছন দিকের বোতাম সে তো লাগাতেই পারে না। মা-ই তাকে সাজিয়ে দেন রোজ—আর দিদিও—কিন্তু দিদি কি এখন আর নড়বে ওখান থেকে, শাড়ি প'রে পেখম মেলে বসেছে। সে-ও তো তার সবুজ শাড়িটা—কিন্তু তা কেমন ক'রে হবে, নিজে-নিজে পরতেই পারবে না! ঈশ! ঘুমিয়ে পড়েছিলো ব'লেই তো, নয়তো বেশ সেজে-টেজে থাকতে পারতো দিদির মতো। দিদিটা এমন, একবার ডাকলো না তাকে, আর মা—মা-ই বা কী-রকম!

সাজগোজ শেষ ক'রে আর-একবার পরদার ফাঁকে উঁকি দিলো সে। ও মা! এরই মধ্যে চা খাওয়া হ'য়ে গেছে, তপতী দেবী উঠে দাঁড়িয়েছেন, চ'লে যাবেন নাকি এক্ষুনি! মরি-পড়ি ক'রে সে ছুটলো বাবার আলমারির দিকে, যেখানে তার এক বছরের সঞ্চিত সাধ বই-চাপা হ'য়ে লুকিয়ে আছে।

'আর-একটু বসবেন না ?'

'না ভাই, আজ চলি—খুব আনন্দ হ'লো—'

'আমাদের প্রায়ই মনে পড়ে আপনার কথা।'

'সে আমার সৌভাগ্য—'

এই রকম সব কথাবার্তার মধ্যে, তপতী দেবী, মা, বাবা তিনজনেই যখন দরজার ধারে এগোচ্ছেন, আর শাড়ি-পরা দিদিও বড়ো-বড়ো ভাব ক'রে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় ছোট্ট ঝাঁকড়া মাথা, দুটো-দাঁত-পড়া টুনি টকটকে লাল মুখে ছুটে ঢুকলো ঘরের মধ্যে, মা-র আর তপতী দেবীর মাঝখানে এসে জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগলো, হাতে তার ঝকঝকে থালায় সাজানো কালো-কালো লবঙ্গ, শাদা-শাদা ছোটো এলাচ, আর সরু-সরু চিকরিমিকরি শুপুরি।

চলতে গিয়ে তপতী দেবী যেন বাধা পেলেন। পাশে তাকিয়েই মিষ্টি হেসে বললেন, 'বা রে! কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

টুনির মনে হ'লো তপতী দেবীর মতো সুন্দর মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

'মশলা নিয়ে এসেছো—লক্ষ্মী মেয়ে! কিন্তু তোমার মা তো আগেই মশলা দিয়েছেন আমাকে।'

টুনির ঘাড় হেঁট হ'লো, কেঁপে উঠলো ভরা-ভরা লালচে ঠোঁট দুটি।

'আচ্ছা দাও, তোমার থেকেও নিই একটু,' তপতী দেবী একটি লবঙ্গ তুলে নিলেন সেই থালা থেকে, যে-থালা টুনি এক বছর ধ'রে তার ইচ্ছে দিয়ে উজ্জ্বল করেছে, কিন্তু তপতী দেবী থালাটি যেন চোখেই দেখলেন না।

টুনির থালা-ধরা হাতখানা থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো।

তার দিকে তাকিয়ে টুনির বাবা হঠাৎ ব'লে উঠলেন, 'আহা, আসল জিনিশটাই আপনি লক্ষ্য করলেন না, তপতী দেবী—টুনির হাতে আপনারই থালা, আপনিই দিয়েছিলেন ওকে—'

'ও—ও! তা-ই নাকি? হেসে-হেসে, টেনে-টেনে তপতী দেবী বললেন।

'আপনি এলে ওতে মশলা দেবে ব'লে মেজে-মেজে বোধহয় ক্ষয় ক'রেই ফেলেছে—আর আপনি কিনা কিছুই বললেন না!' ব'লে টুনির বিদ্বান বাপ হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মা-ও হাসলেন, শাড়ি-পড়া দিদি খিলখিল ক'রে উঠলো, আর তপতী দেবী মুখ টিপে মুচকি হেসে মুখের কথায় যেন মধু ঢেলে দিলেন: 'ও মা! সত্যিই তো! থালাটি চাঁদের হাতে প'ড়ে চাঁদ হ'য়ে গেছে, দেখছি!' ব'লে নিচু হ'য়ে চুমু খেলেন টুনির কপালে।

টুনি পাথরের মতো শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

*　　*　　*

মা ঘরে এসে ডাকলেন, 'টুনি!'

কোনো সাড়া নেই।

'বা রে! মেয়েটা গেলো কোথায়?' ঘরের চারদিকে তাকাতে-তাকাতে অবশেষে চোখে পড়লো, টুনি ব'সে আছে বাবার লেখার টেবিলের তলায় দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে।

মা কাছে গিয়ে ডাকলেন, 'টুনি, শোন!'

টুনির মাথা আরো নিচু হ'লো, পিঠ আরো একটু বেঁকলো।

'ও, রাগ বুঝি? রাগ তো টুনটুনির হাতে ধরা।' আপন মনেই মা বলতে লাগলেন, 'কিন্তু রাগের কারণটা কী তা-ই তো বুঝলাম না! কারণ না-জানলে তো আর কিছু করা যায় না! তা বড়ো-বড়ো দুটো চমচম রেখেছিলাম টুনির জন্যে, যাই তবে, কাঞ্চাকেই দিই গে'।

এতেও কোনো ফল হ'লো না।

তখন মা মেঝেতে ব'সে প'ড়ে মেয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'কী রে? কী হয়েছে?'

টুনি ঢক ক'রে একবার ঢোঁক গিললো।

'লক্ষ্মী, মা, শোন,' মা অন্যরকম চেষ্টা করলেন এবার, 'থালাটা

কোথায় রে—কী সুন্দর মেজেছিলি, আর কী সুন্দর দেখাচ্ছিলো মশলা সাজিয়ে! এমন কি টুনি ছাড়া আর কেউ পারে! তপতী দেবী দেখে তো অবাক!…কই, দেখি থালাটা!…দেখি না!'

হঠাৎ টুনির নিশ্চল শরীর থেকে হাতের এমন একটা দ্রুত ভঙ্গি হ'লো, যেন তলোয়ার উঠে এলো খাপ থেকে। পরমুহূর্তেই ঝনঝন শব্দে দূরের মেঝেতে ছিটকে পড়লো মোচড়ানো তোবড়ানো একটি পিতলের পিণ্ড।

'এ কী!' মা চেঁচিয়ে উঠলেন। 'এ কী ক'রে হ'লো?' ও, তাই! এইজন্যেই মেয়ে মুহ্যমান। আহা, এত সাধের থালা ওর! কী ক'রে হ'লো এ-রকম?'

কোনো উত্তর নেই।

'সুমি করেছে?'

টুনি চুপ।

'কাঞ্চা?'

টুনি চুপ।

'নিশ্চয়ই কাঞ্চা—কাঞ্চা ছাড়া বাড়িতে এমন অলক্ষী আর কে! দাঁড়া, ডাকছি ওকে।'

চকিতে মুখ ফিরিয়ে টুনি ব'লে উঠলো, 'কাঞ্চা করেনি।'

'কে তবে?'

'আমি।'

'তুই!'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি তুই!'

'হ্যাঁ।'

'তুই পারলি ও-রকম করতে!'

'বিশ্রী! বিশ্রী থালা।' টুনির গলা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো, 'এত পিটোলাম হাতুড়ি দিয়ে—তবু কি ভাঙলো!'

'অঁ্যা! হাতুড়ি দিয়ে—' গলা চড়াতে-চড়াতে মা ঝপ ক'রে থেমে গেলেন, বাকি কথাগুলি যেন গিলে ফেলে হাত বাড়িয়ে মেয়েকে কাছে টেনে আস্তে বললেন, 'কেন রে, কেন করলি এ-রকম?'

'বেশ করেছি! চাই না! ও-থালা আর চাই না।' বলতে-বলতে টুনির গলা ভেঙে গেলো।

মা তাকে দু-হাতে কোলে টেনে বললেন, 'টুনি, বল তো কী হয়েছে—আমাকে বল।'

আর সঙ্গে-সঙ্গে মা-র বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে, ফুলে-ফুলে-ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে, মুখ দিয়ে আওয়াজ না-ক'রে টুনি কাঁদতে লাগলো এমনভাবে যেন সে এখনো প্রাণপণ চেষ্টা করছে কাঁদবে না। কান্নার বেগে দম আটকে এলো, ছোট্ট শরীরটি মুচড়িয়ে-মুচড়িয়ে উঠলো, লাবণ্যভরা মুখখানায় এমন সব রেখা ফুটে উঠলো যা তার মা আগে কখনো ছাখেননি।

এ-কান্না কী, কান্না কেন, মা-ও যেন ঠিক বুঝতে পারলেন না। ছোটোদের দুঃখ, ছোটোদের মেজাজ মরজি জেদ, এ তার কোনোটাই নয়; এ-কান্না যেন বড়োদের মতো, যে-কান্না বড়োরা কাঁদে জীবনে একবার দু-বার, এ যেন সেই। মা কিছু বললেন না, কী বলবেন ভেবে পেলেন না; এক হাতে মেয়েকে জাপটে ধ'রে আর-এক হাতে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন শুধু; মনটা তাঁরও যেন বড্ড খারাপ হ'য়ে গেলো।

আস্তে-আস্তে কান্না ফুরিয়ে এলো, ফুরিয়ে গেলো, টুনি শান্ত হ'লো। আরো একটু চুপ ক'রে থেকে মা ডাকলেন, 'টুনি।'

'উঁ।'

'এখন বল কী হয়েছে।'

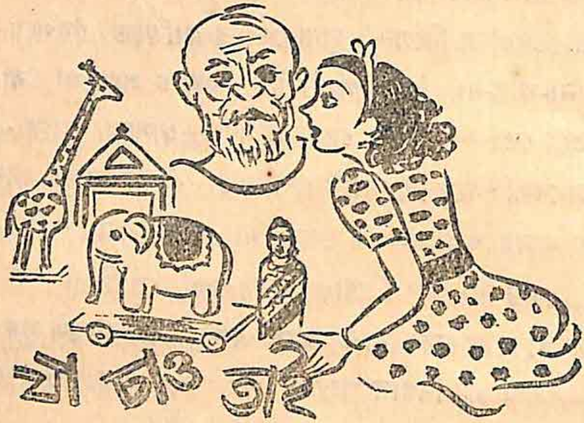
টুনি কিছু বললো না।

মা বললেন, 'তপতী দেবী কত ভালো বললেন তোকে, বললেন, কী লক্ষ্মী, কী সুন্দর মেয়ে—'

'ব'লে দিলে ও-রকম সবাই বলে !'

'ব'লে দিলে মানে ?'

'বাবা তো ব'লে দিলেন,' কান্না-শেষের ক্লান্তিতে হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে প্রায়-শোনা-যায়-না এমন গলায় টুনি বলতে লাগলো, 'বাবা ব'লে দিলেন, তবে তো—! আর তোমরা সবাই হাসলে, আর···আর··· আমি তো খেলছিলাম না, আমি তো সত্যি···'আর বলতে পারলো না টুনি, তার মনের কথা বলবার ভাষা তো সে জানে না, কেউ কি জানে সে-ভাষা, কেউ কি জানে তার মনের কথা, সে কি নিজেই জানে ! ফোলা-ফোলা লাল চোখ মা-র চোখে একবার রেখেই সে মুখ ফিরিয়ে নিলো, এমন একটি নিশ্বাস পড়লো তার, এমন শান্ত, মৃদু, গভীর, যে তার অর্থ না-বুঝেও মা-র চোখে জল এলো ।



নতুন লুডোটা নিয়ে ময়না খেলা করছিলো একমনে, ভল্লু পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ডাকলো, 'দিদি !'

'আঃ !'

'আমাকে একটু দাও না লুডোটা !'

'সর !'

ভল্লু স'রে এসে খপ ক'রে তুলে নিলো একটা লাল রঙের গুটি।

'ভল্লু ! হাত দিস না !'

কথা না-ব'লে ভল্লু নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলো সেই টুকটুকে লাল রঙের আশ্চর্য জিনিশটি।

'দে বলছি !' গলা চড়ালো ময়না।

ছোট্ট তোতা ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে ছুটে এসে বললো, 'দিদি, এসো না একটু লুডো খেলি !'

'না, তোদের সঙ্গে আমি খেলবো না ! যা !'

'এসো না খেলি—' তোতা কাকুতি করলো।

'হ্যাঁ, খেলবোই তো !' ভল্লুর পুরুষালি তর্জন।

'ঈশ !' ময়না হাত চেপে ধরলো ভল্লুর। 'দিয়ে দে গুটি !'

হাতের শক্ত মুঠোর মধ্যে লাল গুটি লুকিয়ে ফেললো ভল্লু।

'দিবি না ?'

'না।'

'দিবি না ?'

'তবে এসো খেলি।'

'হ্যাঁ, খেলবে ! তোদের নাকি লুডো যে খেলবি ?'

'হ্যাঁ তো !'

'না ! কাকামণি আমাকে দিয়েছে—তোদের তো আর ছায়নি !'

'বেশ তো !' তোতা যুক্তি দিলো, 'তোমারই লুডো। কিন্তু একা তো আর খেলা হয় না।'

'আমি একাই খেলবো।'

তোতা ভেকু-ভেকু মুখে চুপ করলো, কিন্তু ভল্লু ছাড়লো না, বীরদর্পে বললো, 'তাহ'লে তোমার লুডো কেড়ে নেবো আমরা !'

'নে দেখি !'

'নেবোই তো !'

'নে না !'

এক হাতে গুটি চেপে ধ'রে আর-এক হাত ভল্লু যেই বাড়িয়েছে লুডোর চার-রঙা ছকের দিকে, ঠাশ ক'রে এক চড় পড়লো তার গালে। তোতা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, আর হাতের গুটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বড়ো-বড়ো নিশ্বাস নিতে লাগলো ভল্লু।

বাবা ঘরে ব'সে ঝগড়াটা শুনছিলেন, বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেন, 'ময়না ! এত অসভ্য হয়েছো !'

'আমার লুডোতে ওরা কেন হাত দেবে ?' মুখের চেহারা বিশ্রী ক'রে ব'লে উঠলো ময়না।

'ছোটো ভাই, ছোটো বোন—তাদের সঙ্গে ঝগড়া !'

'ওরাই তো ঝগড়া করতে এলো !'

'চুপ করো !'

তবু উদ্ধতভাবে ময়না জবাব দিলো, 'আমার তো লুডো !'

'তোমার ? কিছু তোমার না ! আমি সকলকে ব'লে দেবো কেউ যেন তোমাকে কিছু না ছোঁয়—কেউ তোমার সঙ্গে আর খেলবে না—কথা বলবে না—'

'চাইনে, চাইনে কিছু !' ময়না এক ধাক্কায় লুডোটাকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিলো, তার চুলগুলি দড়ির মতো নেমে এসে ঢেকে দিলো মুখ, আর একটু পরেই দশ বছরের মেয়ের গলা-ছাড়া কান্নার চীৎকারে রবিবারের হাসি-খুশি সকালবেলাটা কুচি-কুচি হ'লো।

উনুনের কড়াই নামিয়ে মা এলেন সেখানে।

—'কী হয়েছে ?'

বাবা বললেন, 'কী আবার হবে—এই রকমই তো।'

মা ডাকলেন, 'ময়না ! এই— !'

'থাক, আদরে কাজ নেই ! কাঁদুক যত পারে !' ব'লে বাবা চ'লে এলেন ঘরে।

মা পিছন-পিছন এসে বললেন, 'এত বকাবকিই বা কেন বাপু !'

'ব'কেই বা হবে কী !' বাবা একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে কপালে হাত রাখলেন। 'কী যে করি মেয়েটাকে নিয়ে।'

সত্যি, কী যে করি ! এত সুখ, এত সচ্ছলতা ; খাওয়া, খেলা, গল্পের বই, জামা-কাপড় ;—তবু কী বিশ্রী হিংসুটি স্বভাব হ'লো মেয়েটার ; মিনিটে-মিনিটে ঝগড়া, কান্না, চ্যাঁচামেচি, পাগল ক'রে দিলো ! মস্ত-মস্ত চকোলেটের পাতা একা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খাবে—সবটা খেতে না-পারলে ফেলে দেবে, তবু ভল্লুকে তোতাকে দেবে না ! খেতে ব'সে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখবে, ওদের পাতে বেশি কিছু পড়লো না তো ? সবচেয়ে বড়ো মাছটা তার চাই, ইলিশ মাছের মুড়ো রোজ সে খাবে, কোনো জিনিশ যদি ভাগ ক'রে দিতে হ'লো তাহ'লে আর রক্ষে নেই—অন্যের ভাগ বুঝি একতিল বেশি হ'লো, এই সন্দেহে সে আগে থেকেই হাত-পা ছুঁড়তে লেগে যাবে। যখন

যেটা তার ইচ্ছে হবে, তক্ষুনি সেটা চাই ; ঘ্যানঘ্যান ক'রে, পিছন-পিছন ঘুরে, কেঁদে, চেঁচিয়ে, আদায় ক'রে নেবে পয়সা, কিনে আনবে চকোলেট, আইসক্রীম, বেলুন-বাঁশি—যা তার খুশি ; অন্যদের দেখাবে, খ্যাপাবে, ছুঁতে দেবে না। কত রকম ক'রে চেষ্টা করা হ'লো—ধমকে, মেরে, ভয় দেখিয়ে, লক্ষ্মী-সোনা ব'লে আদর ক'রে—কিছুতেই শোধরাচ্ছে না তো ! আর এই স্বভাব নিয়ে বড়ো হ'য়ে উঠলে ওর উপায় কী ?

বাবা ব'সে-ব'সে দুশ্চিন্তা করতে লাগলেন, এদিকে ছোট্ট তোতা ছড়ানো গুটিগুলো এক-এক ক'রে কুড়িয়ে এনে আস্তে ডাকলো, 'দিদি !'

দিদি মুখ তুললো না।

'শোনো না—'

'যা এখান থেকে !' বাঁশ-চেরা আওয়াজে চেঁচিয়ে উঠলো ময়না।

লুডোর ছক আর গুটির বাক্স দিদির পায়ের কাছে রাখলো তোতা, তক্ষুনি এক লাথিতে দিদি সেটা আবার ছিটিয়ে দিলো। তোতা ম্লান মুখে চ'লে এলো ঘরে। মেঝেতে চিৎ হ'য়ে শুয়ে ভল্লু পড়ছে 'টুনটুনির বই'। দাদার পাশে শুয়ে প'ড়ে তোতা বললো, 'লুডো খেলা বিশ্রী, না দাদা ?'

'ও-সব ব'সে-ব'সে খেলা ভালোই লাগে না আমার !' ব'লে ভল্লু গম্ভীরভাবে পড়তে লাগলো।

সারাদিন ধ'রে রাগে ফুঁশতে লাগলো ময়না। বিকেলে যখন লিলি আর শিপ্রা এসে বললো, 'বেড়াতে যাবি না ?' সে কথা বললো না, অন্য ঘরে গিয়ে ব'সে রইলো। সন্ধেবেলা একতলার গাবু-ছুক্কুরা এলো ; ভল্লু আর তোতা তাদের সঙ্গে কত খেলা, কত গল্প করলো খাবার সময় পর্যন্ত ; ময়নার ইচ্ছে হ'লো ছুটে গিয়ে চটাং-চটাং ক'রে ওদের মারে, মারতে পারলো না ব'লে গুম হ'য়ে ব'সে রইলো একা-একা, আর রাত্রে শুয়ে-শুয়ে ভাবলো যে এমন

কেন হয় না যে সে একা একটা বাড়িতে থাকে, আর-কেউ না, তাহ'লেই তো ভাবনা থাকে না আর, যা সে চায় তা-ই করতে পারে সারাদিন ভ'রে।

দুই

পরের দিন স্কুলের পরে সে লিলি শিপ্রার সঙ্গে বেরোলো না; তাদের তাড়াবার জন্য একটু ঘুর-পথ নিলো। গড়েহাটের মোড়ে একটা বড়ো দোকানে নতুন একরকম চকোলেট দেখেছে সে—এক টাকা দাম—সেটা কিনবে আজ, দু-পয়সা চার পয়সা ক'রে এক টাকার বেশি জ'মে গিছে তার পেন্সিলের বাক্সে! ও-রকম চকোলেট আগে একদিনই খেয়েছে সে—ওঃ, কী চমৎকার, ভিতরে বাদাম-টাদাম কত কী—বাড়ি গিয়ে সারা বিকেল ভ'রে একটু-একটু ক'রে খাবে, ভল্লু তোতা হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকবে, কী মজা হবে—ঈশ! ঐ তো দোকানটা, রাস্তা পার হ'লেই—ময়না ফুটপাত থেকে নামলো—দাঁড়াতে হ'লো একটা বাস্-এর জন্য, তারপর আবার একটা গাড়ি—কী মুশকিল!—বাব্বাঃ! কত্ত বড়ো গাড়িটা আর কী কুচকুচে কালো, এ-রকম গাড়ি তো দেখিনি আর—ভাবতে-ভাবতেই মস্ত কালো জমকালো গাড়িটা থেমে গেলো ঠিক তার পাশে, আর জানলা দিয়ে বেরিয়ে এলো ধবধবে ফর্শা শাদা দাড়িওলা এক বুড়োমানুষের মুখ।

—'ময়না!'

ময়না অবাক! কে? চিনি না তো!

'ময়না, শোনো!'

ময়না তাকিয়ে দেখলো, মনে হ'লো রূপকথার বইয়ের কোনো রঙিন ছবি জ্যান্ত হ'য়ে তার সঙ্গে কথা বলছে। মানুষ কি এত সুন্দর হয় কখনো?

'আমাকে চিনতে পারলে না? আমি তোমার দাদু।'

অ্যাঁ! এত বড়ো গাড়ি-চড়া এই আশ্চর্য সুন্দর মানুষটি—ইনি তার দাদু! বুকের ভিতরটা লাফিয়ে উঠলো ময়নার।

'ছাখো তোমার জন্য কী এনেছি।' ময়না দেখলো, ভদ্রলোকের হাতে সেই চকোলেট, যে-রকম সে কিনতে যাচ্ছিলো। তবে ঠিক সে-রকমও নয়; দোকানের প্যাকেটটা মোটে তার হাতের সমান, আর এটা একটা বইয়ের মতো লম্বা আর মোটাসোটা। এত বড়ো চকোলেট!

'আরো অনেক আছে। দেখবে এসো।' টুক ক'রে খুলে গেলো গাড়ির দরজা।

পা বাড়িয়েও ময়না থমকে গেলো। কত শুনেছে মা-র মুখে! অচেনা কারো সঙ্গে কথা বোলো না রাস্তায়, কারো হাত থেকে কিছু নিয়ো না—খুব সাবধান! কিন্তু ইনি তো দাদু! সত্যি দাদু? তাহ'লে আগে এঁকে দেখিনি কেন? বাঃ, তা বুঝি হ'তে পারে না—শিপ্রা তো তার মামাকেও ছাখেনি জন্ম থেকে, দশ বছর বিলেতে ছিলেন মামা—ইনিও হয়তো বিলেতে-টিলেতে—কিন্তু আমাকে তাহ'লে চিনলেন কী ক'রে?

'এসো, উঠে এসো।'

ময়না উঁকি দিয়ে দেখলো, গাড়ির মেঝেতে কার্পেটের উপর কত রকম জিনিশ সাজানো—যেন আস্ত একটি মনোহারি দোকান—যাবো? যাই না, কী হবে—আঃ, গাড়ির ভিতরটা কী—ময়না আর ভাবতে পারলো না, হালকা শরীরটিতে ঢেউ তুলে উঠে পড়লো, আর সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িটা একটুও শব্দ না-ক'রে, একটুও ঝাঁকুনি না-দিয়ে, এমন মোলায়েমভাবে চলতে লাগলো যে মনেই হ'লো না চলছে।

স্প্রিং-বসানো চওড়া গদিতে ছোট্ট ময়না যেন ডুবে গেলো। দাদু তার কাঁধে হাত রেখে হেসে বললেন, 'কী, ভয় করছিলো আমাকে দেখে?'

ময়না মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সত্যি তুমি আমার দাদু?'

'সত্যি না তো কী!'—ভদ্রলোক হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন।—'ছাখো না কত কিছু এনেছি তোমার জন্য! দাদু না-হ'লে এ-সব আনে কেউ?'

টিনে-টিনে বিস্কুট, কাঠের চৌকো ছবি আঁকা বালতিতে টাপুটুপু টফি, কাচের মতো কাগজে মোড়া বড়ো-বড়ো বাক্স-ভরতি চকোলেট, কাচের গেলাশে রং-বেরং লজেঞ্চুষের রামধনু, এক বছরের বাচ্চার সমান বড়ো-বড়ো ডল-পুতুল, বেগনি বেনারসি আর কুঁচোনো ধুতি পরা ছোট্ট ফুটফুটে বর-কনে, আরো কত কী, কত রকম খেলা যা চোখে ছাখেনি কোনোদিন, কত রকম জিনিশ যার নাম জানে না। দেখতে-দেখতে ময়নার চোখ দুটি ডল-পুতুলের চোখের মতোই স্থির হ'লো, যেন পাতা পড়ে না, যেন চোখের পিছনে কোনো প্রাণ নেই; লোভে, ইচ্ছায়, আনন্দে জ্বরের মতো কাঁপতে লাগলো তার শরীর।

সবচেয়ে বড়ো ডল-পুতুলটা তার কোলের উপর রেখে দাদু বললেন, 'আর-কাউকে কিন্তু দিয়ো না।'

দেবো! প্রাণ থাকতে কাউকে দেবো আমি! ইঃ—এ-সব নিয়ে যখন বাড়ি যাবো, তখন ভল্লু তোতার অবস্থাটা! ডলটা কোলে নিয়ে অন্যগুলোর দিকে তাকাতে লাগলো ময়না—কোনটা ফেলে কোনটা দেখবে?—সব আশ্চর্য, সব সুন্দর—তার ইচ্ছে করলো লাফাতে, গড়াতে, ধেই-ধেই ক'রে নাচতে, চীৎকার ক'রে গলা ফাটাতে। ফুর্তির চাপ আর সইতে না-পেরে হী-হি ক'রে একটুখানি হেসে ফেলে বললো, 'আর এগুলো—এগুলোও আমার?'

'আর কার তবে?'

'সব?'

'সব তোমার।'

'সব আমার। হী-হি···হী-হি! আর কাউকে দেবো না তো কোনোটা?'

'না, কাউকে দেবে না!' আবার হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন দাদু।

'সব আমার। সব আমার। আর কারো নয়—আমার—আমার—হী-হি-হি!' ময়না আহ্লাদে সত্যি-সত্যি যেন গ'লে গেলো। 'দাদু, তুমি কী ভালো! কী ভালো! তোমার মতো ভালো আমি কাউকে বাসি না!' ব'লে সে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরলো।

দাড়ির ফাঁকে মুচকি হেসে দাদু বললেন, 'কিছু খাচ্ছো না যে? ইশকুল থেকে আসছো—খিদে পায়নি?'

আর কি খিদের কথা মনে আছে ময়নার! কিন্তু দাদু ছাড়লেন না; নানারকম চকোলেট, টফি, বিস্কুট ভেঙে-ভেঙে তার মুখে দিতে লাগলেন; কোনোটা মুখে মাখনের মতো গ'লে যায়, কোনোটার গন্ধ ছোটো এলাচের মতো, কোনোটা আমসত্ত্বর মতো টক-টক—যত খায় আরো খেতে ইচ্ছে করে, খেতে-খেতে ময়নার যেন ঘুম পেলো, চোখ বুজে এলো।

হঠাৎ খুব আস্তে একটু ঝাঁকানি লাগলো, ময়না চোখ খুলে বাইরের দিকে তাকালো এতক্ষণে। এ কী? কোথায় এলো? এ তো কলকাতা নয়। ধুলো-ওড়া ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে তারা; মানুষ নেই, বাড়ি নেই, গোরু নেই, কুকুর নেই, শুধু মাঝে-মাঝে সাপের মতো আঁকাবাঁকা ডালের শুকনো-শুকনো গাছ। বিকেলের ঝকঝকে রোদ ম'রে গেছে; আকাশটা হলদে-হলদে লালচে-লালচে ছাই রঙের; সন্ধে হয়ে আসছে, কিন্তু একটা কাক নেই আকাশে। সামনের দিকে তাকিয়ে ময়না দেখতে পেলো টকটকে লাল পোশাক পরা ড্রাইভারের বিছের মতো লালচে সরু লিকলিকে ঘাড়টা; আর লালচে ছাইরঙের আকাশ, আর ধূ-ধূ মাঠ, ধূ-ধূ মাঠ। ভয় পেয়ে ব'লে উঠলো, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'এই তো এসে গেছি প্রায়,' দাদু নরম গলায় জবাব দিলেন।

'কোথায়?'

'বাড়ি।'

'না, না, এখানে তো বাড়ি নয় আমাদের—'

'এখানেই। আমার বাড়িতেই থাকবে তুমি।'

'না, না,' ময়না চেঁচিয়ে উঠলো। 'আমি বাড়ি যাবো, আমাকে বাড়িতে দিয়ে এসো!'

'পাগল!' ময়নার হাতের উপর আস্তে হাত রাখলেন দাদু। যেন পাথরের হাত, যেমন শক্ত তেমনি ঠাণ্ডা। আরো ভয় পেয়ে সে আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি বাড়ি যাবো! আমি বাড়ি যাবো!'

কল দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ার মতো শব্দে দাদু আস্তে-আস্তে বলতে লাগলেন, 'আমার বাড়ির নাম যা-চাও-তা-ই। পৃথিবীতে এ-রকম বাড়ি আর নেই। সেখানে যে যা চায় তা-ই পায়। কিন্তু আর কেউ নেই সে-বাড়িতে, একলা তুমি থাকবে সেখানে, একলা তুমি, একলা তুমি, একলা তুমি।'

'আমি বাড়ি যাবো!'

'তোমার জন্যই বাড়ি বানিয়েছি আমি, তোমার কথা ভেবেই সাজিয়েছি। যা চাও সব পাবে। সব, সব, সব!'

'আমি বাড়ি যাবো!'

মা যেন কতবার হরিকে পাঠিয়েছেন স্কুলে, রাস্তায়, শিপ্রাদের বাড়ি, ভানুদের বাড়ি, কতবার রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন; তারপর বাবা ফিরেছেন আপিশ থেকে—অস্থির হ'য়ে ছুটোছুটি করছেন—এতক্ষণে থানায় হাসপাতালে খবর নেয়া হচ্ছে হয়তো—আর ভল্লু মুখ চুন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে চুপ ক'রে—আর তোতা—তোতাটা বোধহয় ভেউ-ভেউ ক'রে কেঁদেই ফেলেছে। গাবু ছুক্কু ওঠা নামা করছে বার-বার, পাশের বাড়ির মিণ্টু-মাসির মা রান্নাঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে খবর নিচ্ছেন মা-র কাছে, শোভনদা পড়াশুনো ফেলে বনবন ক'রে ঘুরছে সাইকেল নিয়ে; সারা পাড়া তোলপাড়—ময়না হারিয়ে গেছে। ময়না হারিয়ে গেছে! সত্যি? সত্যি আমি হারিয়ে গেছি?

'আমি বাড়ি যাবো! আমি বাড়ি যাবো!' চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো ময়না।

'এই তো এসে গেছি। ···দেখতে পাচ্ছো?'

বাইরে তাকিয়ে ময়না কান্না ভুলে গেলো।

দূরে, যেন আকাশের গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে গম্বুজওলা বাড়ি, থিয়েটারের সীনে যে-রকম আঁকা থাকে সেই রকম, সত্যি ব'লেই বিশ্বাস হয় না। আস্তে-আস্তে কাছে এলো,—হাঁসের মতো শাদা, যেন একটা হাঁস ডানা মুড়ে শুয়ে আছে, এখনই উড়ে যাবে। তারপর আকাশের লালচে ভাব ক'মে-ক'মে যখন ফ্যাকাশে ছাইরংটাই ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীতে, তখন গাড়ি এসে দাঁড়ালো ফটকে, জ্বলজ্বলে লাল অক্ষরে তার গায়ে লেখা, 'যা-চাও তা-ই।' শ্বেতপাথরের জাফরি-কাটা প্রকাণ্ড ফটক প্রকাণ্ড হাঁ ক'রে খুলে গেলো, গাড়ি ঢুকলো ভিতরে।

সঙ্গে-সঙ্গে আলো জ্ব'লে উঠলো ঘরে-ঘরে, ভেসে এলো জল-তরঙ্গের রিনিঠিনি বাজনা, গাড়ি থেকে নেমে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠলো তারা, অদ্ভুত জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই করা দরজা পার হ'য়ে ভিতরে ঢুকলো। দাদু ময়নাকে হাতে ধ'রে নিয়ে যেতে লাগলেন রক্ত-রঙের মখমলের পরদা ঠেলে এ-ঘর থেকে ও-ঘর। ময়না দেখলো এক-একটা ঘর তাদের সারা ফ্ল্যাটের সমান, আর ঐ-রকম তিনটে ঘর ভ'রে শুধু খেলা—শুধু খেলার জিনিশ। আর কী সব খেলা! এখানে মেঝের উপর রেল-লাইন পাতা, ট্রেন চলছে, এঞ্জিনে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, স্টেশন, সিগন্যাল, মাঠ, বন, সাঁকো, সুড়ঙ্গ—কিছু বাদ নেই, এমনি নীল কোর্তা-পরা পয়েন্টসম্যান লাইন-বদল ক'রে দিচ্ছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। ওখানে আস্ত একটা শহর—রাস্তা, ট্র্যাম, দোকান, লোকজন, পুলিশম্যান, কাগজওলা, মই কাঁধে গ্যাস জ্বালবার লোক। কোথাও উঁচু-নিচু পাহাড়ি দেশ, আঁকাবাঁকা শব্দ-করা ঝরনা, দূরে বরফের গায়ে গোলাপি রোদ্দুর, কোথাও জঙ্গল, হরিণেরা বেড়াচ্ছে,

ময়ূর পেখম ধরেছে, গাছপালার সবুজের ফাঁকে জ্বলজ্বল করছে আগুনের মতো বাঘ। ময়নার মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠলো, চোখ যেন বেরিয়ে এলো ঠিকরে, শুকিয়ে গেলো গলা, ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে বললো, 'আর আছে ?'

'দ্যাখো তো খাবার ঘরটা কেমন,' দাদু একটু হেসে তাকে আর-একটা ঘরে নিয়ে এলেন।

সেখানে দেয়াল ভ'রে ছবি আঁকা—মাঠে চরছে গোরু, নদীতে খেলা করছে মাছ, টুকটুকে লাল-লাল ফলের ভারে আপেলগাছ নিচু হ'য়ে পড়েছে—আর লম্বা-লম্বা কাচের টেবিলের উপর রুপোর বাসনে থরে-থরে সাজানো প্যাগোডার মতো কেক, বাতাবিনেবুর মতো রসগোল্লা, আমের মতো বড়ো-বড়ো লিচু, কাঁঠালের মতো বড়ো-বড়ো আম, আর···না, আর দেখতে পারে না, আর দেখবে না···উঃ!

'এ-কলটা খুললেই তরমুজের শরবৎ, এ-বোতামটা টিপলেই আইসক্রীম,' দাদু বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। 'খেলতে-খেলতে তোমার যদি খিদে পায়, তার জন্যেই এ-ঘরটা করেছি। আসল খাওয়াটা একটু দূরে। আর তোমার কাপড়ের ঘর—'

আরো একটা ঘরে ময়না এলো দাদুর সঙ্গে। মুক্তোর হাতল লাগানো হাতির দাঁতের আলমারি সারি-সারি সাজানো। রাশি-রাশি ফ্রক ; তারপর শাড়ি, জামা, গয়না ; একটার পর একটা আলমারি খুলতে-খুলতে দাদু বললেন, 'বড়ো হ'য়ে এ-সব পরবে—কেমন ?'

সিল্ক, জর্জেট, শিফন, সাটিন, অর্গ্যাণ্ডি, ঢাকাই, কটকি, মান্দ্রাজি, মনিপুরি, বেনারসি ; হলদে সোনা, সবুজ পান্না, আলো-জ্বলা হিরে—চোখের পরিশ্রমে দম বন্ধ হ'য়ে এলো ময়নার, দু-হাতের মুঠো শক্ত ক'রে চোখ বুজে ফেললো।

দাদু গুনগুন ক'রে বললেন, 'পরবে তো এ-সব ?'

কী বলবে ময়না ? এ-প্রশ্নের কি কোনো উত্তর আছে ?

'আমার কাছে থাকবে তো সারা জীবন ?'

'থাকবো, থাকবো, নিশ্চয়ই থাকবো!' পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে প'ড়ে দাহুর হাঁটু জড়িয়ে ধরলো ময়না।

'লক্ষ্মী মেয়ে!' দাহু আদর করলেন চুলে হাত বুলিয়ে।

'আরো ঘর আছে?' ময়না জিগেস করলো।

'আরো ঘর?' দাহু হাসলেন। 'পঞ্চাশটা ঘর আছে এ-বাড়িতে—সব দেখতে অনেকদিন লেগে যাবে তোমার।'

'এখানে আর-কেউ থাকে না?'

'আর-কেউ!' দাহুর হুধের মতো শাদা মুখ হঠাৎ যেন কালির মতো কালো হ'য়ে গেলো, আর তাঁর মোলায়েম গলার আওয়াজ শোনা গেলো গর্জনের মতো—'আর-কেউ আছে কিনা জিগেস করছো তুমি?'

ময়না কেঁপে উঠে বললো—'আমার উপর রাগ করলে!'

'জানো এ-বাড়ির নাম যা-চাও-তা-ই! তুমি যা চাও তা-ই পাবে এখানে—তুমি থাকবে, শুধু তুমি, শুধু তুমি—আর-কেউ না, আর-কেউ না—বুঝেছো?'

'বুঝেছি।'

'ও-রকম কাঁপছো কেন, বোকা মেয়ে!' দাহু আবার স্বাভাবিক হলেন। 'এই বাড়ি—আর এ-বাড়িতে যা-কিছু আছে—সব তোমার—শুধু তোমার—আর-কেউ কিছু নেবে না, কখনো ছোঁবে না কোনো-দিন। ভালো না?'

'ভালো, খুব ভালো,' ঘুম-ঘুম গলায় জবাব দিলো ময়না।

'এবার চলো তোমার শোবার ঘর দেখবে।'

কিন্তু শোবার ঘরে গিয়ে ময়না যেন কিছু দেখতেই পেলো না। যে-গালিচাটার উপর পা রেখে দাঁড়িয়েছে সেটাই মনে হ'লো বিছানার মতো পুরু আর নরম, আর একটুখানি শুয়ে দেখবে ব'লে বিছানায় যেই গা দিয়েছে, অমনি একটা সুখের, স্বপ্নের, অন্ধকারের ঢেউ এসে তাকে টেনে নিয়ে গেলো ঘুমের অতলে।

তিন

পরের দিন চোখ মেলেই সে দেখলো কমলারঙের শাড়ি পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিছানার ধারে। খুশি হ'য়ে বললো, 'তুমি কে?'

মেয়েটি কথা না-ব'লে এগিয়ে দিলো মুখ ধোবার সুগন্ধি জল। পদ্মরঙের শাড়ি পরা আর-একজন, মুখের সামনে ধরলো পাৎলা শাদা চিনেমাটির পাত্র, আরো একজন, চাঁপারঙের শাড়ি তার, ঠেলে নিয়ে এলো চাকা-বসানো টেবিলে সকালবেলার খাবার; টাটকা ফেনা-ওঠা দুধ, দশ রকম মিষ্টি, সাত রকম ফল, ছোটো-ছোটো নানা রঙের গেলাশে নানা রঙের ফলের রস।

'তোমরা দাসী বুঝি?' একে-একে তাদের মুখের দিকে তাকালো ময়না। কেউ কোনো জবাব দিলো না; কমলা-শাড়ি চ'লে গেলো মুখ ধোবার বাসন নিয়ে, চাঁপা-শাড়ি কোলের উপর পেতে দিলো এক্ষুনি-ইস্ত্রি-করা, একটু-একটু-গরম, মোটা, শাদা কাপড়, আর পদ্ম-শাড়ি এগিয়ে দিতে লাগলো এক-একটি ক'রে থালা-গেলাশ।

বাঃ, মজা তো! রীতিমতো রানী হ'য়ে গেছি! রানীর মতোই মাথা উঁচু ক'রে বললো, 'তোমরা অনেকদিন কাজ করছো এখানে?'

কমলা-শাড়ি ফিরে এলো ঝিনুকের তৈরি বাটিতে আঙুল-ডোবা জল নিয়ে, চাঁপা-শাড়ি ফল কাটতে লাগলো, আর পদ্ম-শাড়ি দাঁড়িয়ে রইলো একটু দূরে, মাথা নিচু ক'রে। কেউ কোনো কথা বললো না।

আর আলাপের চেষ্টা না-ক'রে ময়না খেতে লাগলো। যত ইচ্ছেই থাক, খেতে আর কতটুকু পারে, সবটাই চাখলো একটু-একটু—প্রত্যেকটাই আগেরটার চেয়ে ভালো মনে হয়—ঈশ, সে কেন দশজন হ'লো না, তাহ'লে তো সব খেতে পারতো! ভল্লু তোতা থাকতো যদি এখানে—উঃ! হঠাৎ যেন একটা ছুরি বিঁধলো তার বুকে—এ কী? কী হ'লো—বুকে হাত চেপে স্থির হ'য়ে রইলো একটু,

চোখের সামনে ভেসে উঠলো তোতার ঝাঁকড়া মাথাটা আর ভল্লুর চকচকে চোখ দুটো—আঃ, ওদের দেখাতে পারলো না!—তক্ষুনি ব্যথাটা ক'মে গেলো, ময়না উঠে দাঁড়ালো আস্তে-আস্তে।

চকিতে থালা-গেলাশ আর তার খেতে-না-পারা রাশি-রাশি খাবার নিয়ে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেলো তিন দাসী, আর ছবির মতো এগিয়ে এলো আরো তিনজন, আঙুর-রঙের, ঘাস-রঙের, টিয়ে-রঙের শাড়ি পরা, তাকে ধ'রে-ধ'রে নিয়ে গেলো সাজ-ঘরে; চারদিকে আয়নার দেয়াল, আয়নার টেবিলে কাটা-কাচের কৌটোতে শিশিতে পঞ্চাশ প্রসাধন; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ময়না দেখতে লাগলো নিজের অগুনতি প্রতিমূর্তি, আর ঘাস-রঙা একের পর এক ফ্রক দেখাতে লাগলো তাকে, আঙুর-রঙা দিলো চুল বেঁধে, আর টিয়ে-রঙা আলতা পরাতে লাগলো পায়ে।

'নাম কী তোমাদের?' ময়না জিগেস করলো একের পর এক মুখের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু এরাও কোনো কথা বললো না, যে যার মনে কাজ ক'রে চললো।

শাদা মসলিনের ফ্রক প'রে সূর্য-ওঠা ঝকঝকে ভোরবেলার মতো বেরিয়ে এলো ময়না। দাসীরা যেন হাওয়া হ'য়ে গেলো, সামনে দাঁড়িয়ে দাদু একমুখ হেসে জিগেস করলেন, 'কী গো, কেমন আছো?'

দু-হাত ছড়িয়ে ঘুরপাক খেয়ে ময়না জবাব দিলো কথার।

'রাত্তিরে ঘুমিয়েছিলে?'

'ওঃ, যা ঘুমিয়েছি!'

'সকালে উঠে খেয়েছো?'

'ওঃ, যা খেয়েছি!' দাদুর হাত ধ'রে নাচতে লাগলো ময়না। হঠাৎ থেমে বললো, 'দাদু, বাইরে অত চ্যাঁচাচ্ছে কারা?'

'ও কিছু না।'

'কী-রকম বিশ্রী চ্যাঁচামেচি!'

দাদু হেসে বললেন, 'গ্যাখো না কাণ্ড! তুমি খেয়ে যা বেশি হয়েছে সব ফেলে দিচ্ছে কিনা, রাজ্যের ভিখিরি এসে জুটেছে আরকি।'

'খাচ্ছে বুঝি কুড়িয়ে-কুড়িয়ে?'

'খাবে!' দাদুর অট্টহাসিতে ঘরের দেয়াল সুদ্ধু কেঁপে উঠলো। 'খাবে কেউ! চটকে, থেঁৎলে, লাথি মেরে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে না ওরা—কেউ পাবে না! একটা ছিটে পাবে না কেউ! সেইজন্যেই তো ও-রকম হায়-হায় ক'রে বুক চাপড়াচ্ছে সব! তা আমার ময়না-মণিকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না, ময়না-মণি এখন খেলা করবে।' দাদু আদর ক'রে হাত রাখলেন তার হাতে, আবার পাথরের মতো ঠাণ্ডা, পাথরের মতো শক্ত লাগলো হাত।

একটু চুপ ক'রে থেকে, একবার ঢোঁক গিলে, মুখ তুলে দাদুর দিকে তাকিয়ে ময়না বললো, 'ভিখিরিগুলি ভারি অসভ্য, না দাদু!'

দাদুর মুখের ভাঁজে-ভাঁজে হাসির ঢেউ উঠলো।—'ঠিক! কী বুদ্ধি আমার নাৎনির! চলো এখন রেলগাড়ির ঘরে।'

খেলাঘরে এসেই ভিখিরিদের চ্যাচামেচি ভুলে গেলো ময়না। সারাদিন ধ'রে রেলগাড়ি চালাবে সে—স্টেশনে থামবে, বাঁশি বাজবে, পয়েণ্টস্‌ম্যান লাইন বদলাবে—আঃ, এমন খেলা আর-কি কেউ চোখে দেখেছে কোনোদিন?

দাদু বললেন, 'আচ্ছা, তুমি তাহ'লে খেলা-টেলা করো—'

'দাদু—' কী-একটা বলতে গিয়ে ময়নার গলায় কথা ঠেকে গেলো। জানলার বাইরে কাদের দেখা যাচ্ছে? ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ের লম্বা একটি লাইন—সামনে কয়েকজন ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে জানলার কাচে নাক ঠেকিয়ে দেখছে, কালি-পড়া চোখে গাল-ভাঙা মুখে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে ময়নার ঐশ্বর্য, অসীম ঐশ্বর্য। 'ওরা কারা, দাদু?' একটু কাছে এসে জিগেস করলো।

'দেখছো তো! সবাই কী-রকম হাঁ ক'রে দেখছে তোমাকে!'

'কোত্থেকে এলো ওরা?'

'আরে পৃথিবীতে কি ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ের অভাব!'

'কেউ তো নেই কাছাকাছি? ওরা থাকে কোথায়?'

'ওরা সবখানেই থাকে।'

'ভিতরে আসতে পারে না?'

আবার মুখ কালো ক'রে গ'র্জে উঠলেন দাদু: 'ভিতরে আসবে! ভিতরে আসবে!'

'না, না,' ময়না তাড়াতাড়ি বললো, 'আমি বলছিলাম—ভিতরে তো ওরা আসতে পারবে না ককখনো—না?'

'আসুক তো! বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবে, আর হিংসেয় বুক ফেটে যাবে! কী মজা!'

'সত্যি, কী মজা!' দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে হী-হি ক'রে হাসলো ময়না।

'আর সহ্য করতে পারলো না। ঐ ছাখো—পালিয়েছে সব।'

'তাই তো!' ময়নার চোখের সামনে যেন কতগুলো ছায়া স'রে-স'রে মিলিয়ে-মিলিয়ে গেলো। 'এর মধ্যে গেলো কোথায় এত-গুলো—?'

'ভেবো না, আসবে আবার। তোমাকে হিংসে করার জন্যই তো ওদের জন্ম।'

'দাদু, তুমি একটু খেলবে আমার সঙ্গে?'

'তোমাকে নিয়ে যা খেলা খেলছি, তোমার সঙ্গে খেলবার সময় কোথায়?' দাদু মজা ক'রে চোখ টিপলেন।

'চলি এখন। তোমার চোদ্দ জন দাসী রইলো—যখন যেটা ইচ্ছে ঠিক এনে দেবে, তুমি না-বললেও ওদের ভুল হবে না।'

'আচ্ছা দাদু, দাসীরা কেউ কথা বলে না কেন?'

'কথা বলবে! ওরা দাসী না?'

'কোনোদিন কোনো কথা বলে না ওরা?'

'তাই ব'লে তোমার সঙ্গে! দাসীরা কাজ ক'রে যাবে, কথা

বলা তো ওদের কাজ নয়।—আর তোমারও কিছু বলতে হবে না ওদের—ওরা সব জানে, সব বোঝে।—আচ্ছা, সন্ধেবেলা এসে শুনবো আবার—' আর-কিছু না-ব'লে, আর-কিছু বলবার সময় না-দিয়ে দাদু বেরিয়ে গেলেন।

খেলা, স্নান, সাজ-বদল, খাওয়া, একটু ঘুম, তারপর আবার খেলা, আবার খাওয়া, আবার সাজ-বদল—এই ক'রে-ক'রে দিনটা কেটে গেলো ময়নার। সন্ধেবেলা দাদু এসে বললেন, 'কী-রকম? কেমন ছিলে?'

'ভালো, খুব ভালো।'

'খেলা করেছো?'

'সারাদিন।'

'খেয়েছো?'

'কত বার!'

'বেশ!—এখানেই থাকবে তো সারা জীবন?'

'এখানেই থাকবো।'

'কোথাও যাবে না?'

'কোথাও যাবো না।'

রোজ সকালে দাদু বেরিয়ে যান; চোদ্দ জন দাসী নিয়ে, অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে নেশার ঘোরে কেটে যায় তার সারাটা দিন। সন্ধেবেলা ফিরে এসে রোজ এক কথা জিগেস করেন দাদু, রোজ সে এক উত্তর দেয়।

সকালে বেরোবার আগে দুটো-তিনটে ক'রে নতুন ঘরে দাদু তাকে নিয়ে যান। এক-একটা ঘরে ঢোকে আর আনন্দে চীৎকার ক'রে ওঠে। তারপর আশ্চর্য জিনিশ দেখতে-দেখতে এমন হ'লো যে কিছুতেই আর অবাক লাগে না।

একদিন সে জিগেস করলো, 'দাদু, রোজ তুমি বেরিয়ে যাও কেন?'

দাহু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, 'কাজ।'

'রোজ তোমার কাজ? একদিনও ছুটি নেই!'

'উ-হুঁ!' দাহু মাথা নাড়লেন।

'রোববারেও না?'

'না, একদিনও ছুটি নেই আমার।'

'তবে আমাকে একদিন নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে।'

'পাগল!'

'গেলে কী হয়?'

'তুমি বাইরে যাবে কী! পৃথিবীর সমস্ত সুখ তোমার জন্য এখানেই তো জড়ো করেছি। যা তুমি চাও তা-ই দিয়ে ঘিরে রেখেছি তোমাকে। বাইরে কী আছে?'

ময়না চুপ ক'রে রইলো।

দাহু আবার বললেন, 'এত সুখে থেকেও বাইরে যেতে চাইবে, এমন বোকা মেয়ে তো তুমি নও! বাইরে গেলেই তো পাঁচশো হাত লিকলিক ক'রে উঠবে তোমার সুখে ভাগ বসাতে। এখানে কেমন একা-একা আনন্দে আছো!'

'দাহু,' ময়না নিচু গলায় বললো, 'তুমি একদিন থাকো না আমার সঙ্গে খেলবে!'

'কেন, ভয় করে নাকি?' দাহু হাসলেন, 'ভয় কিছু নেই এখানে। কারো সাধ্য নেই এ-বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারে।'

'কেউ পারে না?'

ময়নার মুখের দিকে জ্বলজ্বলে চোখে একটু তাকিয়ে থেকে দাহু বললেন, 'না, ঢুকতেও পারে না, আর একবার ঢুকলে বেরোতেও পারে না। দরজাগুলি এমন ক'রে করিয়েছি—আমি ছাড়া কেউ জানে না—'কথা শেষ না-ক'রে দাহু বেরিয়ে গেলেন সে-দিনের মতো।

চার

দিনের পর দিন একরকম। রাশি রাশি খাবার, জামা-কাপড়, খেলা ; আর রং-বেরঙের শাড়ি-পরা চোদ্দজন নিঃশব্দ দাসী। এমন কাজ করে ওরা, যেন মানুষ নয়! হঠাৎ একজন সামনে এসে দাঁড়াবে শরবতের গেলাশ নিয়ে, তাকে দেখে তবে ময়না বোঝে তার তেষ্টা পেয়েছিলো। খেলতে-খেলতে যদি কখনো ঢুলুনি আসে, তক্ষুনি একজন এসে তাকে আস্তে কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। কোনো-একটা জামা যদি একটুও খশখশে লাগলো—ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে টিয়ে-রঙের দাসী নরম-নরম দশটা জামা দু-হাতের মধ্যে ধ'রে। কিছু বলতে হয় না, ডাকতে হয় না ; কাজটুকু ক'রে দিয়েই চ'লে যায়, আবার দরকারের সময় ঠিক জিনিশটি হাতে ক'রে ঠিক কাছে এসে দাঁড়ায়।

একদিন কমলা-শাড়িকে সে বললো, 'আমার সঙ্গে খেলবে একটু?'

কমলা-শাড়ি মাথা নিচু ক'রে আস্তে-আস্তে চ'লে গেলো।

পদ্ম-শাড়িকে সে বললো, 'খেলবে একটু আমার সঙ্গে?'

চমকে একবার তাকিয়েই পদ্ম-শাড়ি যেন মিলিয়ে গেলো হাওয়ায়।

'এসো না একটু খেলি আমরা।'

চাঁপা-শাড়ি কেঁপে উঠে ছুটে পালালো।

একে-একে চোদ্দজন দাসীকে জিগেস করলো সে, একে-একে চোদ্দ জন বিনা-কথার দাসী পালিয়ে-যাওয়া জবাব দিলো।

খেলা ফেলে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো এ-ঘর থেকে ও-ঘর। পৃথিবীতে যা-কিছু দামি, যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু আশ্চর্য, তা-ই দিয়ে সাজানো বিরাট ঘরগুলি শূন্য প'ড়ে আছে দিনের পর দিন—কেউ নেই, কেউ নেই। একে-একে পঞ্চাশটা ঘর দেখা হ'য়ে গেলো তার : কেউ নেই।

আরো কাটতে লাগলো দিনের পর দিন—সাজ, খাওয়া, খেলা; খাওয়া, খেলা, সাজ;—আরো নতুন-নতুন খেলা এনে দিলেন দাদু, আরো সাজ, আরো গয়না;—আর কত অবাক হবে, আর কত সুখী হবে; ম'রে যাবে নাকি শেষটায়?

একদিন আবার দেখতে পেলো জানলার বাইরে গাল-ভাঙা-ভাঙা চোখে-কালি-পড়া ছেলেমেয়ের ভিড়। সবাই হিংসে করে তাকে—করবে না! এত সুখ—উঃ, এত সুখ—আর না—আর সইতে পারে না—হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো—'এসো না তোমরা, খেলবে—!' কথা শেষ হ'লো না, 'উঃ— !' ব'লে লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে, যেন দশটা ছুরি একসঙ্গে বিঁধলো তার শরীরে।

বাজের মতো আওয়াজে দাদু ডাকলেন, 'ময়না!' কী ভীষণ চেহারা! উনুনের মতো মুখ, ধোঁয়ার মতো দাড়ি, চোখ দুটো যেন গনগনে কয়লা।—'ময়না!'

'আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না!' ময়না চীৎকার ক'রে উঠলো।

'মনে থাকে যেন,' চোখ থেকে আগুনের হলকা বের ক'রে দাদু চ'লে গেলেন।

অনেকক্ষণ সে মেঝেতেই প'ড়ে রইলো, কিন্তু চোদ্দ দাসীর একজনও এলো না কাছে। কাঁদতে চেষ্টা করলো—কান্না এলো না। গলা শুকিয়ে গেলো, মুখ ভরা যেন ছাই, বুক ফেটে যাবে—একটু কান্না দাও, একটু চোখের জল—উঃ!

সন্ধেবেলা দাদু তাকে এনে দিলেন আস্ত দোতলা একটা বিলিতি বাড়ি; তার সমানই উঁচু; দরজা জানলা খাট চেয়ার টেবিল যেখানে যা থাকবার কথা, সব ঠিকঠাক! ময়নার চোখের তারা চিকচিক ক'রে উঠলো।

দাদু বললেন, 'বেশি ভালো না এটা, না '

'খুব ভালো।'

'তবে যে হাসি নেই মুখে?'

ছুটে গিয়ে দাদুর হাত ধ'রে ময়না বললো, 'দাদু, তুমি খুব ভালো।'

'আমাকে ভালোবাসো তুমি?'

'খুব।'

'এখানেই থাকবে সারাজীবন?'

'থাকবো, থাকবো, থাকবো!' বিলিতি বাড়ি নিয়ে মেতে উঠলো ময়না।

কিন্তু বিলিতি বাড়ি পুরোনো হ'য়ে গেলো দুদিনেই। কোনো খেলাতেই তেমন মজা আর লাগে না কেন? এত খেলা—সব সে ছুঁয়েও দেখতে পারেনি এখনো—কিন্তু যেখানে যা-কিছু চোখে পড়ে, সব যেন পুরোনো, খেলতেই ইচ্ছে করে না।

দিনের পর দিন। দিনের পর দিন! কী ভারি, কী লম্বা, কী চুপচাপ! ময়না কান পেতে থাকে—কোথাও কি একটা কুকুর ডাকে না, একটা কাক? কই, না! চোখ দিয়ে দেয়ালে মেঝেতে খুঁজে-খুঁজে বেড়ায়—একটা টিকটিকি, আরশোলা—না, একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত নেই। কিছু নেই, কেউ নেই; শুধু ঘর, ঘরের পর ঘর; শুধু জিনিশ, অদ্ভুত, আশ্চর্য, অন্তহীন, প্রাণহীন জিনিশ।

মস্ত-মস্ত ডল-পুতুলদের বুকে জড়িয়ে সে বলে, 'বলো, বলো, কথা বলো, একটা কথা বলো! তারপর রাগ ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ফোঁশফোঁশ ধোঁয়া ছেড়ে রেলগাড়ি যখন চলে সাঁকোর উপর দিয়ে, হঠাৎ গাড়ির গায়ে লাথি মেরে বলে, 'সত্যি তো তুমি গাড়ি নও, কোথাও তো নিয়ে যেতে পারো না, এই ঘরের মধ্যেই সারাদিন ঘোরো! ভেঙে দেবো সব, কিচ্ছু রাখবো না!'

লাথি খেয়েও স'রে যায় না গাড়ি—আশ্চর্য কল!—সাঁকো পার হয়ে সুড়ঙ্গের দিকে চলতে থাকে। উঃ, হাজার বার, লক্ষ বার সে দেখেছে এ-সব—আর না, আর না! ছুটে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে,

তবু ঘর, ঘরের পর ঘর, তবু জিনিশ, জিনিশের পর জিনিশ! কোথায় যাবে? কোথায় যাবে?

আবার একদিন জানলায় ছেলেমেয়েদের মুখ।

ময়নার চোখ যেন আটকে গেলো: জানলার কাচে নাক লাগিয়ে কালি-পড়া দুঃখ-ভরা চোখে তাকিয়ে আছে কে?—ভল্লু! তোতা! আর তাদের পিছনে লিলি, শিপ্রা, গাবু, ছুক্কু, তার ক্লাশের সব ক-টি মেয়ে, আর যত ছেলেমেয়ে সে চেনে, সব, সব তাকিয়ে আছে দুঃখ-ভরা ভিক্ষে-চাওয়া চোখে। ময়না চোখ সরাতে পারলো না, মুখ ফেরাতে পারলো না, দু-হাত বাড়িয়ে ছুটে গেলো, দু-হাত চাপড়াতে লাগলো কাচে, মাথা ঠুকতে লাগলো, কিন্তু একটু শব্দও হ'লো না, তেমনি তাকিয়ে আছে সারি-সারি দুঃখ-ভরা চোখ—ভল্লু—তোতা! 'আয়, আয়,' চীৎকার ক'রে উঠলো ময়না, 'সবাই আয়!'

সঙ্গে-সঙ্গে বিঁধলো চল্লিশটা ছুরি তার সমস্ত শরীরে। দাদু কাছে এসে দাঁড়ালেন একটা দৈত্যের মতো, বাঘের মতো গ'র্জে উঠলেন, 'আবার!'

যন্ত্রণায় পশুর মতো গড়াতে-গড়াতে ময়না বললো, 'ডাকো, ডাকো ওদের! আর পারি না!'

'কী!' ময়নার কান ফেটে গেলো আওয়াজে, তার শরীরে হাজার পিন ফুটলো, বিকট শব্দে সে ব'লে উঠলো, 'আর না, আর মেরো না, তোমার পায়ে পড়ি!'

সেদিন সন্ধ্যায় দাদু তার জন্য আনলেন সত্যিকার শ্বেতপাথরের একটি তাজমহল, সত্যিকার মণিমুক্তো-বসানো, প্রায় চোখেই পড়ে না এমন কাচের বাক্সে ভরা। ময়না একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলো।

'বিশ্রী এটা, না?' দাদু হাসলেন।

ময়না জবাব দিলো, 'না, সুন্দর।'

'উহুঁ, হ'লো না। ভালো ক'রে বলো।'

'খুব, খুব, খুব সুন্দর', বলতে বলতে হী-হি ক'রে হেসে উঠলো ময়না।

'এই তো—লক্ষ্মী মেয়ে! ছাখো না, আরো কত এনে দেবো তোমাকে!'

আরো, আরো, আরো! দিনের পর দিন! দিনের পর দিন! কত বছর, কত যুগ যেন কেটে গেলো। ঘরের পর ঘর সে ঘুরে বেড়ায়, মাইলের পর মাইল, এক ঘর থেকে আর-এক ঘর; ঘরের শেষ নেই—কোথায় দরজা, কোথায় বেরোবার দরজা, অদ্ভুত জীবজন্তু আঁকা যে-দরজা দিয়ে ঢুকেছিলো সেটা কোনখানে? আর দরজা নেই? কোথায়? কোথায়? বড়ো-বড়ো জানলাগুলিতে মাকড়শার জালের মতো রুপোর তার বসানো, একটু রোদ চড়লেই খশখশের পরদা নেমে আসে, ছড়িয়ে পড়ে চন্দনের গন্ধ, সেই গন্ধ, সেই অন্ধকার তাকে যেন চেপে ধরে একটা কুটকুটে কম্বলের মতো। ঘেমে ওঠে, দম আটকে আসে—কিছুতেই সে কি বেরোতে পারবে না এখান থেকে, কোনোদিন না? জিনিশ—জিনিশ—শুধু জিনিশ—সব মরা; তাকাতে পারে না, ছুঁতে ভয় করে; রাশি-রাশি খেলা; শ্বেতপাথর, কষ্টিপাথর, ছবি, মূর্তি; হাতির দাঁতের আসবাব, মখমলের রক্ত-রঙা পরদা; সাটিন, শিফন, সোনা, পান্না, হিরে—সব মরা, সব মরা; তার চোদ্দ জন কথা-না-বলা রং-বেরঙের সুন্দরী দাসী, তারাও মরা;—'আমিও ম'রে যাবো, ম'রে যাচ্ছি—না, না, বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও, বাঁচাও!'

ময়না চীৎকার ক'রে উঠলো, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না। বুক ফেটে গেলো কান্নায়, কিন্তু এক ফোঁটা জল নামলো না চোখে। 'কান্না—কান্না দাও—একটু কাঁদতে দাও আমাকে—উঃ, আর পারি না!'

আবার একদিন কাচের জানলায় সারি-সারি ছেলেমেয়ের মুখ। সকলের সামনে ভল্লু আর তোতা, ঠাণ্ডা কাচের উপর মুখ পিষে ফেলছে তারা—দুঃখ দিয়ে আঁকা তাদের চোখ, গাল ঠেলে বেরিয়ে আসছে হাড়, হাত দুটো ভিখিরির মতো রোগা-রোগা—আর তাদের পিছনে সবাই, সবাই, যত ছেলেমেয়েকে সে চেনে সকলেই এসেছে;

তাছাড়া আরো, আরো, তাকিয়ে শেষ দেখতে পেলো না ময়না, হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ, পৃথিবী পার হ'য়ে গেছে, আকাশ ছাড়িয়ে গেলো। হাত বাড়িয়ে সে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো জানলাটার উপর—'আয়, আয়, আয় তোরা, সকলে আয়!'

একশো ছুরি একসঙ্গে বিঁধলো তার শরীরে, একটা আগুন-লাগা বাড়ির মতো দাদু এসে দাঁড়ালেন, তাঁর গলার আওয়াজে পৃথিবী যেন কেঁপে উঠলো।

—'আবার!'

'ডাকো! ওদের ডাকো! ওদের ডাকো!'

'তবু!'

একটা-একটা ক'রে ময়নার নখের মধ্যে লম্বা-লম্বা ছুঁচ যেন সমস্তটা চ'লে গেলো।

গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলো, 'মারো! আরো মারো! মেরে ফ্যালো আমাকে! এর চেয়ে ম'রে যাওয়া ভালো, ম'রে যাওয়া ভালো।'

'না, মারবো না তোকে! সারা জীবন এখানে থাকবি তুই—সারা জীবন—সারা জীবন!'

যন্ত্রণায় পাগল হ'য়ে গিয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো, দাঁত বসিয়ে দিলো হাতের পাতায়; কাপড়ে আগুন লেগে যারা মরে তারা যেমন দৌড়োয়, তেমনি ছুটতে-ছুটতে বলতে লাগলো, 'আমি যাবো, আমি যাবো; আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও!'

শিষ দিয়ে-দিয়ে চাবুক নাচলো, ময়নার চামড়া কেটে মাংস ছিঁড়ে গেলো। যেদিকে ছোটে, যেদিকে যায়, নেচে-নেচে চাবুক চলেছে পিছনে। 'মেরে ফ্যালো! মেরে ফ্যালো আমাকে!'—বলতে গিয়ে গলা যেন ফেটে গেলো, বুক থেকে গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠলো একটা নাড়ি-ছেঁড়া কষ্ট, তারপর ফোঁটা-ফোঁটা নামলো চোখ দিয়ে, ঝরলো গাল বেয়ে, মুখ ভিজিয়ে দিলো।—আঃ, কী শান্তি, কী শান্তি!

মরতে-মরতে হঠাৎ যেন বেঁচে উঠলো ময়না। কোনো কষ্ট তো আর নেই! তার বুকের মধ্যে যেন কান্নার জোয়ার, কান্নার সমুদ্র—আর ভয় কী! সে আর দেরি করলো না—প্রাণপণে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো; লাফিয়ে-লাফিয়ে পিছনে এলো চাবুক—ঘরের পর ঘর, পরদার পর পরদা, আয়না, ছবি, মূর্তি, সোনা, পান্না, মুক্তো—আরো ছুটতে হবে, আরো জোরে, রাশি-রাশি জিনিশ, রাশি-রাশি জিনিশ—তারপর ছুটতে-ছুটতে আর যখন ছুটতে পারে না, তক্ষুনি দেখলো বেরিয়ে এসেছে আকাশের তলায়, সেই শুকনো শূন্য মস্ত মাঠের মধ্যে।

আবার ছুটলো ময়না। পিছনে পাঁচশো চাবুকের শোঁ-শোঁ শব্দ, ধুলোর ঝড় উঠলো, আকাশ অন্ধকার, কাঁটা ফুটলো পায়ে, কাঁকর বিঁধলো চোখে; তবু ছুটতে লাগলো, মাঝে-মাঝে এক-একটা গাছের আঁকাবাঁকা ডাল সাপের মতো গলা বাড়ালো তাকে ধরবে ব'লে, কতবার প'ড়ে গিয়ে মাথা ফাটলো পাথরে, আবার উঠে ছুটলো; চারদিক থেকে চারশো ডাকাতের মতো ধুলোর ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর, আর তার বুকের মধ্যে যেন কতকালের ঠাণ্ডা বরফ গ'লে গিয়ে লোনা আর গরম কান্নার ঝরনা নামলো চোখ দিয়ে। 'বাঁচলাম, বাঁচলাম—হে ঈশ্বর, কত দয়া তোমার, আমাকে বাঁচালে—আর-একটু, আর-একটু শক্তি আমাকে দাও!' বলতে-বলতে সাতশো চাবুকের মতো শুকনো গরম ঝড় প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গিয়ে ঝরঝর, ঝরঝর ক'রে বৃষ্টি নামলো—আঃ, কী ভালো, কী ভালো লাগে, আমার জন্যও এত ভালো লাগা আছে! চুপ ক'রে চোখ বুজে সে দাঁড়িয়ে রইলো, যেন গ'লে গেলো বৃষ্টির জলে আর চোখের জলে, তারপর চোখ মেলে দেখলো—স্বপ্নের মতো দেখলো—মাঠ পার হ'য়ে এসেছে, ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই; রাস্তা, শহর, লোকজন, ঝকঝকে রোদ্দুরের বিকেল।

পাঁচ

ময়না চোখ রগড়ালো কয়েকবার, বোকার মতো চারদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো। সত্যি ? সত্যি সে দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাত থেকে নেমে রাস্তা পার হবার জন্য, হাতে স্কুলের বই, উল্টো দিকে ঐ মনোহারি দোকান ? সত্যি ? সব সত্যি ? সব তেমনি আছে ? নিজের হাতে চিমটি কেটে দেখলো, রাস্তাটা পা দিয়ে ঠুকলো কয়েকবার। তারপরে ঐ চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েই এক লাফ দিলো আনন্দে, এক ছুটে বাড়ি চ'লে এলো।

বারান্দায় তার শব্দ পেয়েই বেরিয়ে এলো তোতা। কাছে এসে চুপি-চুপি বললো, 'দিদি, তোমার লুডোটা আমি তুলে রেখেছি তোমার দেরাজে।'

ভল্লু এসে বললো, 'দিদি, তোমার সেই লাল-নীল পেনসিলটা খুঁজে পেয়েছি আমি। এই নাও।'

—আর কাল থেকে ওদের সঙ্গে আমি কথা বলিনি রাগ ক'রে! হাতের বই নামিয়ে ময়না তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো—তাকে কাঁদতে দেখলে কী ভাববে ওরা ?

চোখ-মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকে মা-কে দেখতে পেয়েই ছুটে গিয়ে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলো।

'কী রে ?'

ময়না মাথাটা ঘষতে লাগলো মা-র কাঁধে।

'কী ?'

লজ্জা-লজ্জা মুখ তুলে ময়না বললো, 'আমার খুব ভালো লাগছে, মা।'

'কী হয়েছে ?'

'কিছু হয়নি। এমনি। খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে—আঃ!' চোখ বুজে, মা-কে আঁকড়ে ধ'রে ময়না নিশ্বাসের সঙ্গে টানতে লাগলো মা-র গায়ের মিষ্টি গন্ধ, বাড়ি ফেরার শান্তি, বেঁচে থাকার আনন্দ।



বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু লিলি সত্যি-সত্যি পরি দেখেছে। সত্যিকার পরি। তোমারও হয়তো—জ্যোছনা যখন বাগান ভ'রে রেশমি ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে, কোনো কোন রাত্রে তোমারও হয়তো মনে হয়েছে যে তুমি পরিদের দেখছো—নীল রাত্রি ভ'রে তারা নাচছে আর হাসছে, আর ঠাট্টা করছে তোমাকে, জানলার ধারে তুমি দাঁড়িয়ে আছো। কিন্তু একটু পরেই তুমি বুঝতে পেরেছো যে পরিরা মোটেই সত্যি নয়, তোমার কানে লেগেছিলো হাওয়ার আর পাখির শব্দ ; জ্যোছনায় রেশমি-রুপোলি তোমাদের সবুজ বাগানে কোনো পরি কখনো আসবে না। আর মাস গেছে, বছর গেছে, কোনো পরি তোমার কখনো চোখে পড়েনি। তাই, লিলি সত্যি-সত্যি পরি দেখেছে, এ-কথা শুনলে হয়তো একটু অবাকই লাগবে।

কিন্তু সত্যিই তাই। এতটুকু সন্দেহ নেই। কাল রাত্রে, তখন ভোর হ'য়ে এসেছে বুঝি—লিলি বিছানায় শুয়ে হঠাৎ চোখ

মেললো, আর দেখতে পেলো—ঐ ঠিক তার সামনে, জানলার বাইরে মস্ত একটা চাঁদ, আর তার ম্লান আলোয় ঘরের মধ্যে যেন কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত পৃথিবী চুপ—একেবারে চুপ। আর তারপর কে যেন ঘরের মধ্যে কথা ক'য়ে উঠলো—এত নরম, মিষ্টি সুর, কানে-কানে কথা বলছে যেন। কান পেতে শুনলো লিলি, আর সেই স্বর যেন গান ক'রে উঠলো—এত মধুর সে গান, লিলির ইচ্ছে হ'লো কাঁদে। অবাক হ'য়ে সে ভাবলে, কে এমন ক'রে গান করছে এমন সময়! ঐ তো তার খাটের পায়ের দিকে ছোট্ট শাদা পরি—সত্যি-সত্যি পরি! লিলি চোখ রগড়ে আবার তাকালো—ঐ তো সে দাঁড়িয়ে, ছোট্ট পরি, আর কী সুন্দর! নিজের গানের তালে-তালে দুলছে সে, আর তার হালকা পাখা ওঠা-নামা করছে—এক-জোড়া জাপানি পাখা যেন। লিলি রইলো তাকিয়ে—আর-একটু পরে পরি হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে জানলা দিয়ে বাইরে উড়ে চললো, মস্ত চাঁদের দিকে। আর তার গান একটু-একটু ক'রে মৃদু হ'য়ে মিলিয়ে গেলো হাওয়ায়।

—ঐ যাঃ! দেখলুম তো পরি! লিলি মনে-মনে বললে।

'পরি! পরি!' সে চেঁচিয়ে উঠলো। 'উঃ! কী মজা!' আর এমন খুশিতে তার মন ভ'রে উঠলো যে বাকি রাতটুকু সে ঘুমোতে পারলে না—আর একটু পরেই ভোর হ'য়ে গেলো।

সকালবেলা তার মনে হ'লো যে কাউকে এক্ষুনি কথাটা বলতে না-পারলে সে ফেটে যাবে! তার ছিলো এক ভাই, আর এক বোন, দু'-জনেই স্কুলে পড়ছে। কত কিছু যে তারা জানতো, কত রকম কথা যে তারা বলতো, অন্ত নেই তার। লিলিকে আমলের মধ্যেই আনতো না তারা—কেননা সে নেহাৎ ছেলেমানুষ—সে যে-সব বই পড়ে তাতে অনেক ছবির ফাঁকে-ফাঁকে রঙ-বেরঙের অ-আ-ক-খ বসানো—তার বেশি কিছু নয়।

'জানো,' লিলি গম্ভীর মুখে বললে, 'কাল রাত্রে আমি একটা পরি দেখেছি।'

এ-কথা শুনে হেসে উঠলো তারা, তার স্কুল-পড়ুয়া ভাই আর বোন—তারা তো জানে আসলে পরি ব'লে কিছু নেই !

'কী বোকা তুই,' তার বোন ব'লে উঠলো। 'তুই বুঝি ভাবিস সত্যি-সত্যি পরি ব'লে কিছু আছে ?'

'তুই একটা আস্ত বোকা,' তার ভাই এমন ভাবে কথাটা বললে যে তার পরে আর কিছু বলা যায় না।

লিলির মনে-মনে একটু রাগ হ'লো। সে তো সত্যি-সত্যি পরি দেখেছে—আর এরা বলে কিনা পরি ব'লে কিছু নেই। স্কুলে, সে ভাবলে, কী ছাই-ভস্ম সব শেখায়। তার চোখ থেকে আলো নিবে গেলো, আর একটি কথা না ব'লে সে চ'লে গেলো পাশের ঘরে। সেখানে তার ছোটো খোকা-ভাই শুয়ে আছে দোলনায়, জোরে পা ছুঁড়ছে আর একদৃষ্টিতে হাতের বুড়ো আঙুলটার দিকে তাকিয়ে আছে। এত সুন্দর খোকা আর কি কোথাও আছে—লিলি তাকে কী ভালোই বাসে।

'খোকামণি,' দোলনার ধারে দাঁড়িয়ে সে বললে, 'আমি একটা পরি দেখেছি কাল রাত্রে।'

খোকামণি তার আশ্চর্য নীল চোখ বড়ো ক'রে খুললো ; তারপর বুড়ো আঙুলটা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ করলো।

'খোকামণি, তুমি বলো—আমি একটা পরি দেখেছিলাম—দেখিনি ?'

খোকামণি মাথা নাড়লেন, একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোলো তাঁর গলা দিয়ে। আর লিলির চোখে ফিরে এলো আলো।

যা-ই হোক, এর পর কাউকে আর এ-কথা বলবে না সে। এ তার গোপন কথা। কাউকে সে বলবে না। ম'রে গেলেও না। আর এই যে তার নিজের একটা গোপন কথা—কী গর্ব এতে, কী আনন্দ !

আর পরিরা আসে।

রোজ রাত্রে, সে যখন বিছানায় শুয়ে, লিলি পরিদের ছাখে, শোনে তাদের গান, টের পায় তাদের চলাফেরা। দল বেঁধে আসে তারা, তাদের ছোটো শাদা শরীরে হাতির দাঁতের আভা, যেন গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুল বসন্তের হাওয়ায় ছুলছে। ঘর ভ'রে যায় ছায়ায় আর গুঞ্জনে ; পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে তারা নাচে, এত তাড়াতাড়ি যে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে লিলির নিশ্বাস যেন আটকে আসে। আর বাতাস ভারি হ'য়ে ওঠে তাদের চুলের গন্ধে, আর রাত্রি কেঁপে-কেঁপে ওঠে তাদের গানের আর হাসির শব্দে। 'যদি তাদের সঙ্গে ছুটতে পারতুম আমি !' লিলি মনে-মনে ভাবে, কিন্তু তবু সে চুপ ক'রে শুয়ে থাকে, একেবারে চুপ, একটু নড়াচড়া করলেই এই জাছু যাবে ভেঙে ; বড়ো বড়ো চোখে সে তাকিয়ে থাকে পরিদের স্বপ্নের মধ্যে যেন ; তার মনের মধ্যে উথলে ওঠে এই কথা—কেন সে তাদের একজন হ'তে পারবে না ! আর পরিরা আসে, রাত্রির পর রাত্রি।

লিলির সঙ্গে যদি তোমার দেখা হ'তো দিনের বেলায়, তাহ'লে মোটেও তার গোপন-কথা আঁচ করতে পারতে না। এমন মনে হ'তো না যে তার মধ্যে বিশেষ-কিছু আছে। ফুটফুটে, ছোট্ট একটি মেয়ে, তার বেশি কিছু নয়। তার দাদার আর দিদির কাছে তাও মনে হ'তো না, এমনকি। পরিদের নিয়ে তারা তাকে ঠাট্টা করতো না পর্যন্ত। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতো সূর্যগ্রহণ আর মেরুর রাত্রি আর এমনি সব শক্ত-শক্ত জিনিশ নিয়ে। লিলি থাকতো আলাদা, তার গোপন-কথা নিয়ে একা। ব'য়ে গেছে, সে ভাবতো, চাঁদের ছায়াই সূর্যের উপর পড়ুক, কি সূর্যের ছায়া পৃথিবীর উপর, ভারি ব'য়ে গেছে তাতে, পরিরা তো আছে। পরিরা তার, তার একলার। হাসিতে তার ছুই চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, যেন নিজেরাই তারা সূর্য আর চাঁদ। তেমন কেউ কাছাকাছি থাকলে হয়তো তাকে ধ'রে ফেলতো, কিন্তু তার দাদা আর দিদি মোটেও কিছু লক্ষ্য করলে না—মস্ত বড়ো-বড়ো ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত তারা।

রোজ রাত্রে পরিরা এসে নাচে আর গান করে—এমনি করতে-করতে একদিন লিলির স্কুলে যাবার সময় হ'লো। তার ছোটো আঙুলে লাগলো কালির ছাপ, বিদ্যের টুকরোতে ছোটো মাথাটি ভ'রে উঠতে লাগলো। যথাসময়ে সে জানলে কেন এমন মনে হয় যে চাঁদ বাড়ে আর কমে। (কেননা সত্যি-সত্যি তো আর চাঁদ বাড়ে-কমে না।) তাকে প্রমাণ ক'রে বুঝিয়ে দেয়া হ'লো যে একটা মাঠের ভিতর দিয়ে চ'লে যাওয়ার চাইতে মাঠটা ঘুরে গেলে বেশি হাঁটতে হবে; সে জানলে যে পেরুর রাজধানী লিমা, আর $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ যার মানে ৫=(৩+২)×(৩−২) যার মানে ৫=৫, যে-কথা বোধহয় না-বললেও চলে। এমনি অনেক সব জিনিশ শিখতে-শিখতে ক্লাশ থেকে ক্লাশে সে উঠতে লাগলো; তারপর এমন সময় এলো যখন তার মনে হ'লো সে নিশ্চয়ই এতদিনে বড়ো হ'য়ে উঠেছে। এরই মধ্যে সে শাড়ি পরতে আরম্ভ করেছে, আর খোঁপা বাঁধতে। সত্যি মস্ত বড়ো সে হ'য়ে উঠেছে, কত জিনিশ নিয়ে সে ব্যস্ত—প্রায়ই সিনেমায় যায়, এত বেশি আইসক্রীম খায় যে মাঝে-মাঝে পেট ব্যথা করে। গ্রেটা গার্বোর নাম বলতে সে পাগল; ছু-মাসে একবার তাঁকে চিঠি লেখে একখানা সই-করা ফোটোগ্রাফের জন্য। এমনি ছ-বার চিঠি লেখার পর একদিন সত্যি-সত্যি ছবি এলো। সেই রাত্রে সে ঘুমোতে পারলে না, এত আনন্দ তার মনে।

পরিরা আর আসে না। কোথায় হারিয়ে গেলো তারা, মিলিয়ে গেলো তারা, লিলি টেরও পেলো না। যেন তারা কখনো ছিলো না। আর লিলির তাদের কথা একবার মনেও পড়লো না—সে ব্যস্ত সিনেমা নিয়ে, আর সে ম্যাট্রিকুলেশন দেবে, না কি জুনিয়র কেম্ব্রিজ, এই ভাবনা নিয়ে।

এদিকে লিলির সেই খোকা-ভাই দস্তুরমতো খোকাবাবু হ'য়ে উঠেছে—সোনালি তার গাল, আর ঠিক লিলির মতো তার চোখ।

তাকে আর কেউ খোকামণি বলে না, শুধু মণি বলে। লিলি আর ওর সঙ্গে ওত মাখামাখি করে না—কেননা ও তো নেহাৎ ছেলেমানুষ, আর সে রীতিমতো ভদ্রমহিলা। অবিশ্যি মাঝে-মাঝে যখন ঝোঁক আসে, সে আদর করে ওকে নিয়ে, লক্ষ্মী-সোনা বলে, গল্প বলে বই থেকে। কিন্তু সে খুব বেশি নয়। মণিরও যেন একা থাকতেই বেশি ভালো লাগে। ঠাণ্ডা ছেলে, সে এক কোণে ব'সে চুপচাপ তার ছবির বই নিয়ে খেলা করে, যখন খুশি পাতা ছেঁড়ে, একটা মস্ত ভোঁতা পেন্সিল কোথায় যেন কুড়িয়ে পেয়েছিলো—হিজিবিজি আঁকে তা-ই দিয়ে। ঘরের মধ্যে যে অন্য কেউ আছে, সে খেয়ালই নেই তার। মাঝে-মাঝে নিজের মনেই সে কথা বলে। কেমন একটু অদ্ভুত ছেলে, এই মণি।

একদিন সকালে মণির নীল চোখে একটা আলো জ্ব'লে উঠলো; লিলি যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে, ও এলো কাছে, লিলির দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলো।

'কী রে, মণি?' লিলি বললে একটু তীক্ষ্ণ স্বরে। সময় নেই, স্কুলের বাস এসে পড়লো ব'লে।

'ছোড়দি,' একটু ভয়ে-ভয়ে মণি বললে, 'আমি পরি দেখেছি কাল রাত্রে।'

'পরি!'

'পরি,' মণি আবার বললে।

'এখন রাখ ও-সব বাজে কথা। ছ্যাখ তো খুঁজে আমার চুলের কাঁটা—ও চুলের কাঁটা, তুমি কোথায় লুকোলে? এক দিন এই কাঁটাগুলোর জ্বালায় আমি পাগল হ'য়ে যাবো—যাঃ, ঐ তো বাস্ এসে পড়লো।'

লিলি ছুটে বেরিয়ে গেলো, মণির দিকে একবার তাকালোও না। আর মণির চোখ থেকে হঠাৎ যেন আলো স'রে গেলো।

কিন্তু সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে লিলির মনে তা ফিরে এলো।

মণি পরি দেখেছে, তা-ই তো বললে। সে, সে-ও তো একদিন—এক সময়—টনটন ক'রে উঠলো তার বুক, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলো, কী ভাবলো নিজেই বুঝতে পারলে না। আকাশে চাঁদ, ঘরের মধ্যে অন্ধকার হালকা। লিলি তাকিয়ে রইলো—তাকিয়ে রইলো! কী যেন ন'ড়ে উঠলো, লাফিয়ে উঠলো তার বুকে। বুঝি—? না—চোখ টান ক'রে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার চোখে জল এসে পড়লো—কিছু না। চাঁদ ঠিক তার জানলার বাইরে এসে দাঁড়ালো, সমস্ত ঘর আধো-আলোয় এলোমেলো। লিলি তাকিয়ে রইলো, প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস—কই, কিছু না। কিছু না। আর আসে না পরিরা।

আর ভোরের দিকে চোখ ফিরিয়ে এনে বালিশের উপর মুখ চেপে ধরলো। হঠাৎ তার বুক ভেঙে নামলো কান্না; ভাঙা-ভাঙা গলায় সে ব'লে উঠলো, 'কেন, কেন, কেন তোমরা আমাকে ছেড়ে গেলে?'

খাবার আগের গল্প

তরঙ্গিণী আমার কানে-কানে চুপি-চুপি বললো, 'ও মামা, ওটা কী!'

তরঙ্গিণী নাম শুনে ঘাবড়ে যেয়ো না, এত বড়ো একটা গাল-ভরা নামের যিনি মালিক, দেখতে তিনি ছোট্ট, বয়েস তাঁর চার। তাও এটা তাঁর আসল নাম নয়, আসলে তাঁর নাম এণাক্ষী, কি মণিমালা কি বিশাখা (কোনটা আমার ঠিক মনে নেই), আর তাঁর বাবা-মা তাঁকে ডাকেন বাবলি, কি হাবসি, কি কুট্টুস—যখন যেটা মুখে আসে। আমি এঁকে ডাকি তরঙ্গিণী, কারণ ঢেউয়ের মতোই এঁর দাপাদাপি।

সে অবশ্যি শুধু বাড়িতে। বাড়ির বাইরে (কি বাড়িতেও অচেনা লোকের সামনে) তরঙ্গিণীর আলাদা মূর্তি। মাথা নিচু ক'রে, ছোট্ট হাত শক্ত মুঠো ক'রে, কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে—কেউ ডাকলে কাছে আসে না, চোখ তুলেও তাকায় না, বাড়ির লোকের সঙ্গে নেহাৎই কোনো কথা বলতে হ'লে বলে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিশফিশ ক'রে। এই ছাখো না, গিয়েছি এক বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে, তার সঙ্গে ভাব করতে বাড়ির সবাই ব্যস্ত, কিন্তু মেয়েটা গেলো কি কারো কাছে একটু! আমার জামার কোণা খামচে ধ'রে সেই যে শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কেউ একটু নড়াতে পর্যন্ত পারলে না।

দিদি ভারি কুনো করেছেন মেয়েটাকে।

এরি মধ্যে এক ফাঁকে—অর্থাৎ অন্য সবাই যখন রান্নার আর কত দেরি খোঁজ করতে উঠে গেছেন, ঘরে আমি আর তরঙ্গিণী শুধু আছি—সে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'ও মামা, ওটা কী?'

ঘরের মেঝেতে পাতা চিতাবাঘের চামড়াটার দিকে অনেকক্ষণ ধ'রেই চোখ পড়ছিলো তরঙ্গিণীর—তার একটা কারণ অবশ্যি এই যে

এতক্ষণ সে লজ্জায় চোখ তুলেই তাকাতে পারেনি। আমি বললুম, 'চেনো না? বলো তো কী?'

'ওটা কি বাঘ?'

'হ্যাঁ—চিতাবাঘ।'

'ও, বুঝেছি—চিতাবাঘ। চিতাবাঘ।' নতুন কথা শেখবার আগ্রহ তরঙ্গিণীর অসীম; একটা কথা প্রথম শোনামাত্র দু-তিনবার আউড়িয়ে সেটা এমন রপ্ত ক'রে ফেলে যে মনে হয় জন্ম থেকেই সে কথাটা জানে।—'তা চিতাবাঘ বুঝি কামড়ায় না?'

'তা কামড়ায় বইকি।'

'ও কামড়াবে?' তরঙ্গিণী চোখ বড়ো ক'রে বললে।

'না—ও আর কামড়াবে কেমন ক'রে? ও তো ম'রে গেছে।'

'ও বুঝেছি; ম'রে গেছে।' তরঙ্গিণী গম্ভীরভাবে বললে বটে, কিন্তু চামড়ার যেদিকটায় দাঁত-বের-করা মাথাটা ছিলো, সেদিকে তাকিয়ে কথাটা বিশ্বাস করা তার পক্ষে বোধহয় কঠিন হ'লো। তাই সে বললে, 'কিছুতে—ই কামড়াবে না? গায়ে হাত দিলেও না?'

'ছাখো না গায়ে হাত দিয়ে। এই ছাখো!' চামড়াটির উপর একটু হাত বুলিয়ে ওকে অভয় দিলাম। তরঙ্গিণী নিচু হ'য়ে ওর ল্যাজের দিকটা দু-আঙুল দিয়ে একটু ছুঁয়েই হাত সরিয়ে আনলো।

'দেখলে তো?'

এবার আর-একটু সাহসী হ'য়ে তরঙ্গিণী চামড়াটির গায়ে একবার হাত বুলোলো, কিন্তু মাথার দিকে এগোলো না। তারপর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটা দার্শনিক প্রশ্ন জিগেস করলো, 'মামা, ও কি সত্যিকারের বাঘ?'

'তা নয় তো কী?'

'বানানো বাঘ নয়?'

আমি বললুম, 'বাঘ আবার বানাবে কে?'

'তবে ও নড়ে না কেন? ডাকে না কেন? কামড়ায় না কেন?'

'বললুম যে, ও ম'রে গেছে।'

'ও, ম'রে গেছে। কী ক'রে মরলো?'

'দুষ্টুমি করতে গিয়ে।'

'খুব দুষ্টু ছিলো বুঝি ও?'

'ওঃ, ভীষণ দুষ্টু। ও ছিলো ছোট্ট চিতাবাঘ—বাপ-মা-র কথা একটুও শুনতো না।'

'আমাকে একটা ছোট্ট চিতাবাঘ কিনে দিয়ো—আমি খেলা করবো। দিয়ো কিন্তু।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা।'

'চিতাবাঘটা কেন দুষ্টু ছিলো, মামা?'

'দুষ্টু ব'লেই দুষ্টু ছিলো। তুমি দুষ্টুমি করো কেন?'

'আমি তো এ-কটুখানি দুষ্টুমি করি। বেশি তো করি না।'

'তা করবে কেন?—তুমি তো ভালো মেয়ে। আর ও ছিলো খু—ব দুষ্টু ছেলে।'

'কী করতো?'

'কী না করতো! একা-একা বেরিয়ে যেতো বাড়ি থেকে, হরিণ মারতো, বাছুর মারতো, একদিন তো আস্ত একটা মোষই মেরে ফেললে। বাপ বলতেন, "তুই এখনো ছোটো আছিস, ও-সব বড়ো-বড়ো জানোয়ারের সঙ্গে লাগতে যাসনে।" তা কে কার কথা শোনে।'

'কেন মারতো?'

'কেন আবার? খেতো।'

'চিতাবাঘেরা বুঝি বাছুর, হরিণ, মোষ-টোষ খায়?'

'তা না-খেয়ে আর কী করে। খিদে তো পায়।'

'ও, বুঝেছি। দুষ্টু চিতাবাঘকে একদিন একটা মোষ বুঝি মেরে ফেললে?'

'না, মোষের সাধ্যি কি চিতাবাঘ মারে।'

'তবে কে মারলে ওকে?'

'মানুষেই মেরেছে।'

'কেন, মানুষ কি চিতাবাঘ খায়?'

'না, খায় না। ঘরের মেঝেতে চামড়া সাজিয়ে রাখে। দেখছো না?'

'কেন মারলো এই চিতাবাঘকে? ও কী করেছিলো?'

'ওঃ, কী দুষ্টু ছিলো ও, একদিন মারা পড়বে, জানা কথা। বাড়িতে ভালো-ভালো ষাঁড়, মোষ, ছাগল, হরিণ—কত যে খাবার তার অন্ত নেই। মা ভারি ভালোমানুষ—ভাঁড়ারে চাবিও দেন না, ও যখন খুশি যা খুশি খেতে পারে। ওর বাপ জাঁদরেল জঙ্গির এক ডাকে সারা জঙ্গল কাঁপে, তা-ই দেখে অত্যন্ত সাহস বেড়ে গিয়েছিলো ওর —রোজই নতুন-নতুন জানোয়ার মেরে নিয়ে আসতো। বাপকে বলতো, "বাবা, তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাকো, এখন থেকে আমিই সব জানোয়ার মারবো।" '

'ওর নাম কী ছিলো?'

'ওর নাম? ওর নাম ছিলো—রঙ্গী। দেখছো তো ওর গায়ে কেমন রং।'

'আমাকে একটা ছোট্ট, রঙ্গী চিতাবাঘ কিনে দিয়ো!'

'আচ্ছা, দেবো।'

আমার আর বকবক করতে ভালো লাগছিলো না, খিদেও পেয়েছিলো। কিন্তু বন্ধুদের বোধহয় এখনো দেরি, কারোরই দেখা নেই। একটু চুপ ক'রে থেকে তরঙ্গিণী বললে, 'আচ্ছা মামা, মানুষ ওকে মারলো কী করে? ওর তো কত বড়ো-বড়ো দাঁত, কী লম্বা-লম্বা নোখ—মানুষের ভয় করলো না?'

'মানুষের আবার ভয় কী? বন্দুক আছে তো হাতে।'

'ও, বুঝেছি।'

এটা কিন্তু—দুঃখের সঙ্গে বলতেই হচ্ছে—তরঙ্গিণীর চালিয়াতি। বন্দুক কাকে বলে সে জানেই না, চোখে দেখা তো দূরের কথা।

বন্দুক বলতে ও কী বুঝলো ও-ই জানে, কিন্তু দিব্যি গম্ভীরভাবে বললো, 'বন্দুক দিয়ে মেরেছিলো ওকে?'

'হ্যাঁ, ঠিক কপালের উপর লেগেছিলো গুলিটা।'

'এইখানে?' তরঙ্গিণী তার দু-চোখের মাঝখানে কপালের উপর একটা আঙুল ছোঁওয়ালো।

'ঠিক ওখানে। দেখছো না ওর ওখানটায় একটা ছোট্ট গর্ত, ওটা গুলির দাগ।'

'কপালে গুলি লাগলে কী হয়, মামা?'

'লাগলে আর কথা আছে?'

'ম'রে যায় বুঝি?'

'তা আর বলতে!'

'তা ছোট্ট চিতাবাঘ পালাতে পারলে না?'

'পালাবে কোথায়? গুলি তো দূর থেকেও ছোঁড়া যায়? মা-র কথা যেমন শোনেনি, তেমনি জব্দ।'

তরঙ্গিণী খুব চাপা গলায় বললে, 'আমি সব সময় মা-র কথা শুনি, না মামা?'

'হ্যাঁ, তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে।'

'ছোট্ট চিতাবাঘ কেন লক্ষ্মী হ'লো না মামা?'

'তাহ'লে আর ভাবনা ছিলো কী। এই ছ্যাখো না—সেদিন ওর মা বললেন, "বাবা রঙ্গী, আজ আর বাড়ি থেকে বেরিয়ো না।" তা, রঙ্গী কি কথা শোনে! বলে, "কেমন একটা নতুন রকমের গন্ধ পাচ্ছি মা। ভারি খাশা গন্ধ, জিভে জল আসে।" এ-কথা শুনে রঙ্গীর মা-বাবা মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে হাসলেন। বাপ বললেন, "হাঁউ-মাউ-খাঁউ," আর মা বললেন, "মানুষের গন্ধ পাঁউ।"

'এ-কথা শুনে রঙ্গী বললে, "মানুষ! সে-আবার কী রকম জানোয়ার?" বাপ বললেন, "ওঃ সে এক কিম্ভুত জীব। তবে খেতে

খাশা। হ'লে কি হবে—পাওয়া যায় না। আমি যখন ছোটো, আমার বাবা একটা মেরেছিলেন—তারপর আর খাইনি।” রঙ্গী বললে, “কিছু ভেবো না, বাবা, আমি তোমাকে মানুষ খাওয়াবো।”

'ছেলের কথা শুনে মা শিউরে উঠলেন। বললেন, “রঙ্গী, লক্ষ্মী, সোনা আমার, বাহাদুরিতে কাজ নেই বাবা, মানুষ না-খেলেও আমাদের চলবে, তুই ওদের কাছে ঘেঁষিসনে। ওরা বড়ো ভয়ানক। ওরা সামনের দু-পা দিয়ে কী-একটা লম্বা-মতো জিনিশ ধ'রে থাকে—উঃ সে বড়ো সাংঘাতিক জিনিশ। কথা শোন, রঙ্গী, হাতি খেতে চাস খাওয়াবো—কিন্তু মানুষের নামও মনে আনিসনে।”

'এ-কথা শুনে জাঁদরেল জঙ্গি বললেন, “ওয়াক! হাতি আবার একটা খাওয়ার জিনিশ! তা তোর মা ঠিক বলছেন রঙ্গী, জঙ্গলে মানুষ এসেছে যখন, তখন দু-একদিন একটু সাবধানেই থাকা ভালো। ওরা দেখতে নিরীহ, কিন্তু কাজে শয়তান; না পারে এমন কাজ নেই।”'

তরঙ্গিণী রুদ্ধশ্বাসে বললে, 'তারপর কী হ'লো মামা?'

'তারপর যা হবার তা-ই হলো! রঙ্গী শুনলে না কথা। ছেলেকে অনেক বুঝিয়ে বাপ যেই একটু বেরিয়েছেন, গোটাচারেক হরিণ মেরে আনতে পারলেই আজকের মতো হ'য়ে যায়, আর মা গেছেন সিঙ্গি-পুকুরে জল খেতে—এমন সময় এদিক-ওদিক তাকিয়ে রঙ্গী দে ছুট। ঘুটঘুটে কালো রাত্তির—তা বাঘেরা কিনা অন্ধকারেও চোখে ছাখে—ঝোপ সরিয়ে, পাতা ঝরিয়ে, ডাল কাঁপিয়ে রঙ্গী আস্তে-আস্তে এগোতে লাগলো। ওঃ, চমৎকার গন্ধ মানুষের, সারা জঙ্গল ভ'রে গেছে। একটা মানুষ সে আজ মেরে আনবেই—বাবা কী খুশিই হবেন, আর মা তো অবাক হ'য়ে হাঁ ক'রে থাকবেন—“ও-মা, আমাদের ঐটুকু রঙ্গী, তার নাকি এত কেরামতি!” গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে সে এগোতে লাগলো, এ-গন্ধ যত ভালো, মানুষ যদি খেতেও তত ভালো হয়, তাহ'লে আর কথা কী! পরম কারুণিক ব্যাঘ্রেশ্বর বাঘেদের খাবার

জন্যই মানুষগুলোকে তৈরি করেছেন। এখন পর্যন্ত মানুষ সে চোখে ছ্যাখেনি, কিন্তু বাবার কাছে যা শুনেছে তাতে মনে হচ্ছে খুব একটা নতুন রকমের জানোয়ার ওরা। আচ্ছা, না-হয় মারবে না, কাছেও যাবে না, শুধু একবার দূর থেকে দেখে আসবে ব্যাপারটা কী। কেন 'মানুষ' বললে অমন শিউরে ওঠেন মা-বাবারা।

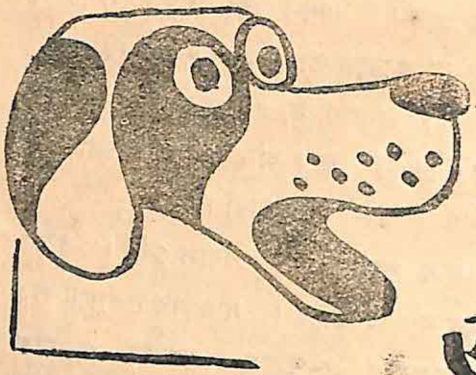
'বাড়ি ছেড়ে কতদূর এসে পড়েছে তার খেয়াল নেই। হঠাৎ রঙ্গীর মনে হ'লো গন্ধটা যেন বড়োই কাছে। সামনের দু-পায়ে ভর দিয়ে সে একটু বসলো, একবার এ-পাশে, একবার ও-পাশে তাকালো—কিন্তু তারপর আর চোখ ফেরাতে পারলো না। ঘুটঘুটে অন্ধকার চিরে তীব্র আলো ঠিক তার চোখের উপর এসে পড়লো, আলো দিয়ে যেন বিঁধে ফেলা হ'লো তাকে। এমন আলো সে কখনো ছ্যাখেনি। একটু পরেই গুড়্—ম শব্দে সমস্ত বন একবার কেঁপে উঠলো, হুংকার ছেড়ে রঙ্গী লাফিয়ে উঠলো শূন্যে, তারপর ধুপ ক'রে প'ড়ে গেলো একটা ঝোপের উপর। আর উঠলো না।'

'চলো এবার, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলুম তোমাদের,' বলতে-বলতে বন্ধু ঘরে ঢুকলেন।

'চলো', আমি খুশি হ'য়ে উঠলাম। বেশ চনচনে খিদে পেয়েছিলো। 'চলো তরঙ্গিণী, খাওয়া যাক।'

তরঙ্গিণী শক্ত ক'রে আমার জামা আঁকড়ে ধ'রে বললে, 'মামা, আমার বড্ড কান্না পাচ্ছে।'

আমি বললুম, 'দূর বোকা মেয়ে!'



ট্যাপির ভাবনা

সবচেয়ে আমার খারাপ লাগে উনি যখন টেবিলের ধারে চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন। টেবিলটার গায়ের মধ্যে মস্ত-মস্ত গর্ত—তার ভিতরে কত কী জিনিশ। তার একটা ধ'রে উনি টান দেন—বেরিয়ে আসে কাগজ আর কলম—এমন বিশ্রী জিনিশ মানুষ আর তৈরি করেনি! তারপর উনি ব'সে আছেন তো ব'সেই আছেন। কী করেন ব'সে-ব'সে? আমি একদিন সামনের দু-পা তুলে মুখ উঁচু ক'রে দেখেছিলুম—কলমের মুখ থেকে কালো-কালো পোকার মতো কী কতগুলো বেরিয়ে আসছে। বিশ্রী! আমি আস্তে-আস্তে আওয়াজ করি, তাকিয়ে থাকি ওঁর মুখের দিকে, কিন্তু খেয়ালই নেই! বা-বাঃ, ঐ কালো-কালো পোকাগুলো নিয়ে কী ভাবনা! আমি যে এতক্ষণ পায়ের কাছে জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে আছি, আমাকে একটুখানি আদর করলে কী হয়? ব'সে থেকে-থেকে আমার গা ব্যথা হ'য়ে যায় রীতিমতো। কিন্তু উনি আমার দিকে তাকানই না। চোখ যদি তোলেন তো জানলা দিয়ে বাইরে। বাইরে কী আছে? বাইরে তো কেবল দুষমনের মতো বিশ্রী লোক, প্রকাণ্ড কালো এক-একটা কুকুর, দেখলেই খেঁকিয়ে ওঠে। তবু যদি উনি ওঁর লাল শাড়িটা প'রে একটু বেড়াতে বেরোন, আমার গায়ের ব্যথাটা অন্তত সারে। উনি সঙ্গে থাকলে আমার ভয় করে না। উনি সব করতে পারেন, উনি ঈশ্বরের

মতো। কিন্তু ব'সে-ব'সে এই একরাশ কালো পোকা তৈরি করা—এর মানে কী? নাঃ, মানুষের কিচ্ছু বোঝা যায় না।

*   *   *

ঘরে ব'সেও তো কত রকম খেলা করা যায়। মনে করা যায় এই চেয়ারটা এক বিদঘুটে কালো কুকুর, আর টেবিলটা একটা গাড়ি। কালো কুকুরটার সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবে। আমি লাফিয়ে উঠে ওর গলায় কামড়ে ওকে ঘায়েল ক'রে দেবো, তারপর এই গাড়ির নিচে চাপা প'ড়ে ও মরবে। না-হয় মনে করো ঐ যে শাদা একটা কাগজ মেঝেতে প'ড়ে আছে, ওটা একটা পাখি; আমি ওকে তাড়া ক'রে অনেক ছুটোছুটির পর ঠিক ধ'রে ফেলবো। এমনি পাখি ভেবে নিয়ে আমি একদিন একটা কাগজ কামড়াতে গিয়েছিলুম—উনি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার কান ম'লে দিয়েছিলেন। কাগজ কামড়ালে রক্ত বেরোয় না—তবু কাগজের উপর এই মায়া কেন?

*   *   *

বাড়ির লোক ওঁকে মিনি ব'লে ডাকে। মিনি! মিনি! সারাদিন কেউ-না-কেউ ডাকছে। আমিও ডাকি, কিন্তু আমার কথা উনি বুঝতে পারেন না। আমার কথা অন্য রকম হ'য়ে বেরোয়।

*   *   *

উনি মস্ত, ওঁর গায়ে খুব জোর। এক ধাক্কায় উনি এই ভয়ংকর ভারি দরজাটা খুলতে পারেন। ওঁর বাবা আরো প্রকাণ্ড, গাড়ির চাকার মতো শব্দ ক'রে তিনি কথা বলেন। এক হাতে ঐ চেয়ারটা তুলে তিনি ও-ঘরে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি বড়ো, ঈশ্বর, তাঁর কাছে যেতে হ'লে আমার চোখ বুজে আসে। ঈশ্বর, আমাকে বাঁচিয়ে রেখো, আমাকে পেট ভ'রে খেতে দিয়ো, আমাকে মেরো না।

আমি ছোটো, আমার রং দুধের মতো, বড়ো-বড়ো নরম রোঁয়ায় ঢাকা আমার শরীর। আমি দেখতে সুন্দর; সেইজন্যই তো উনি আমাকে ভালোবাসেন। যখন ওঁর মন ভালো থাকে, উনি কোলে তুলে

নেন আমাকে, হাত বুলিয়ে দেন আমার গায়ে, খেলা করেন আমার সঙ্গে। তাইতে বুঝতে পারি আমি দেখতে সুন্দর। যা দেখতে বিশ্রী, উনি তা ভালোবাসেন না ; ওঁর শাড়িগুলো ঝলমল করছে। ট্যানি ! ট্যানি ! আমি লাফিয়ে উঠি, তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে যাই ওঁর আগেই বাগানে, তারপর রাস্তায়—আমরা এখন বেড়াতে যাচ্ছি ! বেড়াতে যাচ্ছি !

* * *

উনি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে বেড়াতে যান, উনি আমাকে কোলে তুলে আদর করেন, উনি আমাকে নিজের পাত থেকে খাবার তুলে খেতে দেন—তাই আমি ওঁকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি জানি ইচ্ছে করলে উনি আমাকে মেরে ফেলতে পারেন, তাই আমি ওঁকে ভয় করি। উনি খুব ভালো ; উনি আমাকে কখনো না-খেয়ে থাকতে দেবেন না। কিন্তু একবার উনি যদি রাগ করেন—এমন কী আছে যা উনি না-করতে পারেন ! রাগ কোরো না, রাগ কোরো না আমার উপর।

* * *

এক-একদিন বিকেলে আমি হয়তো ছুটোছুটি ক'রে একটু ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়েছি ; জেগে উঠে—ও মা ! বাড়িতে ওঁর গন্ধও তো আর পাওয়া যায় না। এই ওঁর মনে ছিলো—আমাকে একা ফেলে বেড়াতে যাওয়া ! রাগ হয়, রাগে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে। আজ আসুন না একবার ফিরে—কথাও বলবো না। মন-খারাপ ক'রে চুপচাপ শুয়ে থাকি—তুমি যদি আমাকে শাস্তি দাও, কী করতে পারি আমি ? অনেক রাত ক'রে উনি ফিরে আসেন—বাগানে ওঁর গন্ধ পাই। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে উনি ডাকেন—ট্যানি ! ট্যানি ! আমি সাড়া দিই না, চুপ ক'রে শুয়ে থাকি। তখন উনি ঘরে আসেন আমার খোঁজে, আমি উঠে অন্য ঘরে চ'লে যাই—যেন ওঁকে চিনিই না। কেমন ! এইবার কেমন ! তারপর উনি যখন

নিজের ঘরে গিয়ে ঝকঝকে বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়ান, আমি চুপি-চুপি পিছন থেকে এসে লাফিয়ে এক থাবায় ওঁর চুলের খোঁপা খুলে দিই। উনি মুখ ফিরিয়ে বলেন—দুষ্টু! আমার মারতে ইচ্ছে করে, ওঁকে মারতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস হয় না। উনি যদি সত্যি-সত্যি আমার উপর রাগ করেন, কী উপায় হবে আমার! তাড়াতাড়ি আমি তাঁর জুতোর ফাঁকে মুখ লুকোই ; মুখ চেপে ধরি তাঁর পায়ের উপর।

* * *

মানুষ···মানুষ! কোঁচাওলা আর শাড়ি-পরা মানুষ। এক-একদিন সন্ধ্যাবেলা তারা অনেকে আসে ; কথা বলে। শুনে-শুনে আমার ঘেন্না ধ'রে যায়। একপাল বানরের মতো কিচিরমিচির, কোনো অর্থ হয় না। আমি যখন রাত্তিরে কোনো শব্দ শুনি, রাস্তার কোনো ভিখিরির নোংরা গন্ধ যখন পাই, তখন আমি চেঁচিয়ে উঠি। যখন গোল হ'য়ে শুয়ে আরামে চোখ বুজে আসে, আস্তে-আস্তে গোঙাই। যখন খিদে পায়, মার খেয়ে যখন লাগে, তখন কঁকিয়ে কাঁদি। কিন্তু খামকা দল পাকিয়ে এমন চ্যাচামেচি কে কবে শুনেছে! ঠিক বানরের মতো।

* * *

মোটের উপর বলা যায় শাড়ি-পরা মানুষগুলোই ভালো। কাছে গেলে অন্তত ভদ্রতা ক'রেও তারা একবার মাথায় হাত বুলোয়। কোঁচাওলারা এক-একটি গোঁয়ার, কোনো খেয়ালই তাদের নেই। আমাকে তারা আমলের মধ্যেই আনে না ; তাদের এমন ভাব, আমি যেন নেই-ই। আর তাদের গায়ে একটা বিশ্রী গন্ধ—তামাক-পাতার। একবার তো একজন আমার ল্যাজই মাড়িয়ে দিলে। আমি তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠলুম, কিন্তু সে আমার দিকে একবার ফিরে তাকালো না পর্যন্ত। আর উনিও সেই কোঁচাওলাকে ধ'রে মার দিলেন না। দেবতার মনের ভাব বোঝা মুশকিল।

* * *

একজন কোঁচাওলা আছে—তার চেহারা আমার একটুও পছন্দ হয় না। উনি যে কী ক'রে তাকে সহ্য করেন ভেবে পাইনে। সে যখন আসে তখন আর-কেউ থাকে না। মোটা বই থেকে সে ঘ্যানঘ্যান ক'রে প'ড়ে শোনায়। আর উনি চুপ ক'রে শোনেন ভালোমানুষের মতো। আমি এক-একদিন টেবিলের তলায় শুয়ে শুয়ে শুনেছি—মনে হয় যেন পেত্নি-বেড়ালের ন্যাকামি। এতক্ষণ ধ'রে এই শোনা! উঃ, ওঁকে ভালোমানুষ পেয়ে কী কষ্টই দিচ্ছে লোকটা। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।

* * *

একদিন আমি আর সহ্য করতে পারলুম না। লোকটা দরজার কাছে আসতেই ছুটে গিয়ে ঘ্যাঁক ক'রে বসিয়ে দিলুম তার পায়ে এক কামড়। মানে—বসিয়ে দিতে গিয়েছিলুম, ঠিক লাগেনি। উল্টে তার লাথিই ঠাশ ক'রে এসে লাগলো আমার চোয়ালে। লাগলো আমারই বেশি, কিন্তু সে-কথা কে বোঝে। উনি উঠে এসে আমাকে খুব কষে বকুনি দিলেন, তারপর হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে বন্ধ ক'রে রাখলেন ছোট্ট একটা কুঠুরিতে, যেখানে শুধু কতগুলো পুরোনো বাক্স জড়ো করা। ঘরটা অন্ধকার, ইঁদুর কিলবিল করছে সারাক্ষণ, তাতে ঢুকতেই ভয় করে আমার। সেখানে, সেখানে আমাকে বন্ধ ক'রে রাখা! আমি চোখ দিয়ে কত বললুম, কত বোঝালুম, কিন্তু উনি আমার দিকে তাকালেন না। রইলুম বন্ধ হ'য়ে সেই অন্ধকার ইঁদুরের-গন্ধ-ভরা ঘরে। সেখানে শুয়ে-শুয়ে কত যে কাঁদলাম তা কেউ দেখলে না। ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো, এবার আমাকে ক্ষমা করো। আমি দোষ করেছি, আর আমি দোষ করবো না। এর পর থেকে আমি ভালো হবো। হে দেবতা, হে ঈশ্বর, তোমার শক্তির সীমা নেই; ইচ্ছে করলেই তুমি আমাকে মেরে ফেলতে পারো। আমাকে তুমি মেরো না, আমাকে বাঁচতে দিয়ো।

* * *

রাত্তিরে ওঁর খাটের পায়ার কাছে আমি শুয়ে থাকি ; থেকে-থেকে চমকে উঠি স্বপ্ন দেখে। শাদা বরফে ঢাকা মাঠের উপর দিয়ে তীরের মতো ছুটে যাচ্ছে নেকড়ে। শাদা বরফে জ্যোছনা চকচক করে ; আকাশের দিকে মুখ তুলে চীৎকার ক'রে ওঠে নেকড়ের পাল। সন্ধ্যার আবছায়ায়, বনের ঘন সবুজ থেকে লাল শেয়াল তার চোখা মুখ বের ক'রে দেয়। তার ছুঁচোলো, লোভী, ধূর্ত মুখ, শেয়াল-মুখ ; সে এগিয়ে যায়, সন্ধ্যার আবছায়ায়, চুপে-চুপে, হাওয়া শুঁকতে-শুকতে, কোথায় মুরগি ঘুমুচ্ছে তার বাচ্চাদের নিয়ে। চোর! চোর! কেউ তাকে দেখতে পায় না, কেউ তাকে টের পায় না, শুধু খুপরির মধ্যে মুরগি পায় তার গায়ের গন্ধ, ভয়ে ছটফট ক'রে ওঠে, প্রাণপণে ডানা ঝাপটায়। চোর! চোর! কিন্তু কে তাকে ধরবে? তাকে চোখে দেখতে-না-দেখতে সে চ'লে এসেছে বনের কিনারে, তার মুখের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে একটা বাচ্চা-মুরগির নরম বুক।

এই সব স্বপ্ন দেখে আমি থেকে-থেকে চমকে উঠি। বাইরে কিসের শব্দ হয়। কোথায় পাতা নড়ে। হাওয়ায় জানলার একটা কপাট খুলে যায়। কে? চোর, চোর! সন্ধ্যার ছায়ার ভিতর দিয়ে আগুনের মতো ছুটে চলেছে লাল শেয়াল।

আর উনি, খাটের উপর ঘুমিয়ে, উনি কী স্বপ্ন ছাখেন? গাছের ডাল ধ'রে ঝুলছে নীল বানর, তার চোখে টলমল করছে আরাম। না কি অন্ধকারে হানা দিচ্ছে গরিলার ভীষণ মুখ? বিশাল মহাদেশের নতুন অরণ্য ভ'রে বানরের অর্থহীন, শ্রান্তিহীন চীৎকার। উনি কি তা শুনতে পান ঘুমের মধ্যে? ঘুমের মধ্যে ওঁর কি ভয় করে? না কি উনি স্বপ্ন ছাখেন, রোদে-ভরা এক বিকেলবেলায় বেড়াতে বেরিয়েছেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে, লাল শাড়ি প'রে, গন্ধে-ভরা ফুরফুরে হাওয়ায়?

বিশেষ কিছু নয়



বিশেষ-কিছু নয়, সামান্য এক বাক্স ক্লিপ নিয়ে ব্যাপারটা। এতদূর গড়াবে কে জানতো। ক্লিপ, অতি সাধারণ ক্লিপ, যা দিয়ে কাগজ আটকায়। পঞ্চু গল্প লেখে কিনা, তার ক্লিপ দরকার। বড়ো-বড়ো ফুলিস্কেপ কাগজে গোল-গোল হাতের লেখায় গল্পগুলোর 'ফেয়ার কপি' করে, তারপর লম্বা খামে ভ'রে পাঠিয়ে দেয়; কিছুদিন পরে নির্ভুল ফেরৎ চ'লে আসে তার কাছে। ডাক-খরচ পঞ্চুকেই আগাম দিয়ে দিতে হয় অবশ্য; টিকিট না-দিলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেয়া হয় না, সব কাগজেরই এই নিয়ম।

সেই গল্পের পাতাগুলো আটকাবার জন্যেই ক্লিপ দরকার।

কিন্তু সারা গিরিডি ঢুঁড়েও এক বাক্স ক্লিপ পাওয়া গেলো না। কোলডিহা থেকে বারগণ্ডা পর্যন্ত চ'ষে ফেললো পঞ্চু, কোনো দোকানেই ক্লিপ নেই। সকলেই ছোটো মেয়েদের চুল আটকাবার ক্লিপ দেখিয়েছে, কেউ বা কাপড় শুকোবার কাঠের ক্লিপ, কিন্তু পঞ্চু গম্ভীর হ'য়ে বলেছে—'এ-জিনিশ নয়, কাগজ আটকাবার ক্লিপ চাই।'

কাগজ আটকাবার ক্লিপ! বেশির ভাগ দোকানি এ-হেন জিনিশের নামই শোনেনি। কেউ-কেউ বা নাম শুনেছে, চেহারা ছাখেনি।—'এক গ্রোস যদি নেন, তবে কলকাতায় অর্ডার দিতে পারি, চারদিন পরে পাবেন।'

এক গ্রোস মানে একশো চুয়াল্লিশ। এক গ্রোস নিয়ে সে কী করবে? একশো চুয়াল্লিশটা গল্প লিখতে—মনে-মনে হিশেব ক'রে দেখলে—কম-সে-কম পাঁচ বছর। তাছাড়া, গল্পগুলো তো ফেরৎই আসে, একটা ক্লিপেই অনেকবার চ'লে যায়। আর এই বার-বার ফেরৎ আসতে-আসতে গল্প লেখার উৎসাহই বা ক-দিন থাকবে কে জানে। নাঃ, এক গ্রোস কিনলে স্রেফ লোকশান।

পঞ্চু মন-খারাপ ক'রে বাড়ি চ'লে এলো। গিরিডি শহরটার উপরেই অশ্রদ্ধা জ'ন্মে গেলো তার। আরে ছ্যাঃ, এখানে আবার মানুষ থাকে! একটা ক্লিপ পাওয়া যায় না। পাওয়া যাবেই বা কেমন ক'রে, এখানে তো কোনো সাহিত্যিক থাকে না, ক্লিপ কিনতেই বা আসবে কে। থাকে তো শুধু মাইকার দালাল আর কয়লার কুলি, ক্লিপ তাদের কোন কাজে লাগবে।

অগত্যা পঞ্চু ভাবে, আলপিন দিয়েই কাজ চালাবে। কিন্তু আটটা-দশটা ফুলিস্কেপের পাতা কি একটা খুদে আলপিন গাঁথতে পারে? তা ছাড়া, আলপিনটা যদি কোনোরকমে সম্পাদকের (কি তাঁর ছোটো ছেলের) আঙুলে ফুটে যায়, তাহ'লেই তো গল্পের দফা রফা। একবার পিন ফুটলে আর কি সম্পাদক সে-গল্প পড়বেন, না কি পড়লেই ভালো লাগবে তাঁর!

মনের দুঃখে সে গল্প লেখা প্রায় ছেড়েই দেয়, এমন সময় ঘোর অন্ধকারে আলো দেখা গেলো। খবর পেলো, মণ্টু যাচ্ছে কলকাতায় উইক-এণ্ডে।

মণ্টু তার প্রাণের বন্ধু। পাশাপাশি বাড়িতে থাকে দু-জনে, বিকেলে একসঙ্গে উশ্রী নদীর ধারে হাওয়া খায়, শীতকালে একসঙ্গে ক্রিস্টিয়ান হিল্-এ যায় চড়ুইভাতি করতে। উশ্রী ফল্স্-এ গিয়ে দু-জনে একসঙ্গে একটা ছবি তুলিয়েছিলো—দু-জনেরই ঘরে সেটা বাঁধানো দেখতে পাবে। পঞ্চু তার সব গল্প মণ্টুকে প'ড়ে শোনায়, কেননা মণ্টুর মতামতের উপর তার গভীর বিশ্বাস। সব

গল্পের শেষেই মন্টু বলে—'বাঃ, চমৎকার হয়েছে।' পঞ্চু যখন পড়ে, মন্টু চোখ বুজে-বুজে গভীর মন দিয়ে শোনে—হঠাৎ এক-এক সময় তার নাকের ভিতর দিয়ে ঘোঁৎ ক'রে একটা আওয়াজ বেরোয়।

পঞ্চু বলে—'ঘুমুচ্ছিস নাকি, মন্টু?'

মন্টু বলে—'না, ঘুমুবো কেন? তুই প'ড়ে যা, আমি শুনছি।'

এই ব'লে আবার সে চোখ বোজে। খানিক পরে আবার ঘোঁৎ ক'রে ওঠে। পঞ্চুর এক-এক সময় সন্দেহ হয়; সে ঘুমিয়ে পড়েছে; কিন্তু ঘুমোলে তো আর সে শুনতে পাচ্ছে না, আর না-শুনে কী ক'রে বলে যে গল্পটা চমৎকার হয়েছে? চমৎকার যখন বলে, তখন নিশ্চয়ই শুনেছে, আর শুনেছে যখন, তখন নিশ্চয়ই ঘুমোয়নি। কথাটা ভেবে পঞ্চু ভারি আরাম পায় মনে-মনে।

একদিন হঠাৎ সে ব'লে ফেলে, 'আচ্ছা মন্টু, তুই তো খুব ভালো বলিস, কিন্তু কেউ ছাপে না কেন বল তো?'

'আরে ঐ কাগজওলাদের কথা বলিস কেন! সবই মুখ-চেনাচেনির ব্যাপার, বুঝলি না?'

'হ্যাঁ, তা-ই হবে। অচেনা লোকের লেখা বোধহয় পড়েও না।'

'খেপেছিস! আমার মামা কলকাতার এক ছাপাখানায় কাজ করেন, সেখানে "বৈদ্যহিতৈষী" আর "সাহিত্য-বন্ধু" ছাপা হয়। তাঁর কাছে সব কথা শুনেছি।'

এর পর পঞ্চু মুগ্ধ হ'য়ে মন্টুর কাছে কলকাতার কাগজওলাদের গল্প শোনে। মামা কী বলেছিলেন বা কতটুকু বলেছিলেন মন্টুর ঠিক মনে পড়ে না; তবে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই সে ব'লে যায়—কী করলে গল্প ছাপা হ'তে পারে, সে-বিষয়ে উপদেশও দেয় দুএকটা।

সেই মন্টু উইক-এণ্ডে কলকাতায় যাচ্ছে। পঞ্চু বললে, 'খুব ভালো হ'লো, আমার জন্যে এক বাক্স ক্লিপ নিয়ে আসিস।'

'সে আর বেশি কথা কী। নিশ্চয়ই আনবো।'

'আর···শোন, তোর মামার সঙ্গে দেখা হবে তো?'

'বাঃ, তাঁর ওখানেই উঠবো যে।' তারপর, পঞ্চু কিছু বলবার আগেই বললে, 'এবারে বেশ ভালো ক'রে কাগজওলাদের খোঁজ নিয়ে আসবো। মামা সব জানেন কিনা।'

'তোর মামা তো ইচ্ছে করলেই পারেন ছেপে দিতে, না রে?'

মণ্টু বললে, 'বাঃ, পারেন না! ছাপাখানার সব বই তো তিনিই ছাপান।'

এবার পঞ্চু প্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়লো। 'তাহ'লে তাঁকে একটু বলবি মনে ক'রে?'

'নিশ্চয়ই বলবো। তিনি অক্ষরগুলো সাজিয়ে না-দিলে কিছু ছাপা হবার তো জো নেই। মামাকে কি তুই সোজা লোক ভেবেছিস?'

'তাহ'লে গল্প দু-একটা নিয়ে যাবি নাকি?'

'না, না, এখন থাক। আগে সব কথাবার্তা ঠিক ক'রে আসি।'

এর পর দু-বন্ধুতে আরো অনেক কথা হ'লো। সব কথার শেষে পঞ্চু আবার বললে, 'ক্লিপ এক বাক্স আনিস কিন্তু মনে ক'রে। ভুলিসনে যেন।'

'না, না, ঠিক আনবো।'

মণ্টু বেস্পতিবারে গিয়ে সোমবারে ফিরে এলো। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'তেই গম্ভীর মুখে বললে, 'সব ঠিক ক'রে এসেছি।'

পঞ্চু দুরু-দুরু বক্ষে আরো শোনবার অপেক্ষা করতে লাগলো।

'মামার প্রেসে এবার কার সঙ্গে দেখা জানিস?'

'কার সঙ্গে?'

'ক্ষিতীশ ঘোষ—নাম শুনেছিস?'

পঞ্চু খানিকক্ষণ চিন্তা করে অত্যন্ত লজ্জিতভাবে বললে, 'কই, মনে পড়ছে না তো।'

'তুই একটা হাঁদা। ক্ষিতীশ ঘোষ—যাঁর লেখা "জাগরণ", "বঙ্গ-নারী", "ভাববার-কথা" এ-সব কাগজে ছাপা হ'য়ে থাকে! তাঁর সঙ্গে

দেখা হ'লো—আলাপ হ'লো। তাঁর ঠিকানায় তোর সব লেখা পাঠাবি এখন থেকে, তিনি ছাপিয়ে দেবেন।'

পঞ্চু রোমাঞ্চিত হ'য়ে বললে, 'তুই দেখলি ঐ··ক্ষিতীশবাবুকে? কথা বললি তাঁর সঙ্গে?'

যে-ব্যক্তির লেখা প্রায়ই ছাপার অক্ষরে বেরোয় তাকে যে চোখে দেখা যায় এবং তার সঙ্গে কথা বলা যায় এ যেন পঞ্চুর বিশ্বাস হ'তেই চায় না।

'জানিস, ক্ষিতীশবাবু বলেছেন এবার পুজোর ছুটিতে গিরিডি আসবেন। তখন তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আর কী, তোর তো হ'য়ে গেলো, একদিন খাইয়ে দিস। এই নে তোর ক্লিপ।'

মণ্টু তাহ'লে ভোলেনি, ঠিক মনে ক'রে ক্লিপের বাক্স এনেছে। কৃতজ্ঞতায়, সুখে ও সৌভাগ্যে পঞ্চুর ভিতরটা যেন ছলছল করতে লাগলো। ছোট্ট কাগজের বাক্সে ঝকঝক করছে ক্লিপ, দস্তুরমতো মেড-ইন-ইংল্যাণ্ড, চালাকি নয়।

'কত দাম রে?' পঞ্চু জিগেস করলে।

'দু-আনা।'

'বলিস কী, এত শস্তা!'

'কলকাতায় সব জিনিশই শস্তা।'

'হবে না! ও তো আর গিরিডি নয়! এখানকার দোকানিরা, জানিস, ক্লিপ কাকে বলে তা-ই জানে না!' পঞ্চু খামকা অনেকখানি বেশি হেসে ফেললো।

রাত্তিরে সে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে নতুন একটা গল্প আরম্ভ করলো। ওঃ, ঐ ঝকঝকে ক্লিপ এঁটে সে যখন লেখাটা পাঠাবে, সম্পাদক কি তখনও না-প'ড়ে পারবেন! তা-ছাড়া, এখন তো ক্ষিতীশবাবুই আছেন।

পরের দিন তার মনে হ'লো মণ্টুকে ঐ ক্লিপের দামটা তার দেয়া উচিত। তক্ষুনি একটি দু-আনি নিয়ে গেলো মণ্টুদের বাড়িতে। পকেট থেকে সযত্নে সেটি বের ক'রে বললে, 'এটা নে।'

'কেন?' মণ্টু যেন কিছু অবাকই হ'লো।

'ঐ ক্লিপের দাম।'

'যা-যাঃ, আর বখামি করতে হবে না। ওর আবার দাম দিবি কী রে?'

'বাঃ, জিনিশটা হ'লো আমার, আর তুই তার দাম দিবি কেন?'

'না-হয় দিলুমই। দু-আনা তো পয়সা, হয়েছে কী তাতে?'

'আমিই তো তোকে আনতে বলেছিলুম। দাম যে দেবো এ তো জানা কথাই।'

'দাম দিবি জানলে আনতুমই না।'

মণ্টু কিছুতেই নিলে না দু-আনি, পঞ্চু মন-খারাপ ক'রে ফিরে এলো। সে ভেবে দেখলে, এই দু-আনা পয়সা তার পক্ষেও না-দেয়া অন্যায়, মণ্টুর পক্ষেও না-নেয়া অন্যায়। সে নিজে কিনলে তো পয়সা দিয়েই কিনতো, দোকানি তো আর এমনি দিতো না।

বিকেলবেলা সে আবার গেলো মণ্টুর কাছে। গিয়ে গম্ভীরভাবে বললে, 'ছ্যাখো মণ্টু, এটা কিন্তু তোমার ঠিক হচ্ছে না।'

'কোনটা?'

'ক্লিপের দামটা তুমি দয়া ক'রে নাও।'

'হঠাৎ খেপে গেলি নাকি তুই?'

'আমি কিনলে তো পয়সা দিয়েই কিনতুম।'

'তুই তো আর কিনিসনি।'

'তুই তো কিনেছিস। দোকানি তো তোকে এমনি দেয়নি।'

'তাই ব'লে তোর কাছ থেকে এখন দু-আনা নিতে হবে আমাকে? কক্ষনো নেবো না—ভাগ।'

'তুই এটা না-নিলে আমি একেবারেই শান্তি পাবো না মনে।'

মণ্টু বড়ো-বড়ো চোখে পঞ্চুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুই আমাকে ছোটলোক ঠাউরেছিস নাকি যে তোর কাছে থেকে দু'আনা পয়সা নেবো ?'

'কেন, এতে ছোটলোকোমিটা কী দেখলি ? তুই তো আমার কাছ থেকে নিচ্ছিস না।'

'তবে কার কাছ থেকে নিচ্ছি ?'

'বেশ, আমিই বা তোর কাছ থেকে কেন নেবো ? ক্লিপের বাক্সটা তো আমার।'

'ইচ্ছে হয় তো ওটা উশ্রীর জলে ফেলে দে। তাহ'লেই হবে তো ?'

'আমার কাছ থেকে নিতে তোর সম্মানের হানি হয়, আমারই বা তোর কাছ থেকে নিতে সম্মানের হানি হবে না কেন ? তোর চাইতে আমার সম্মান কি কম ?'

'যা, যা, তোর সম্মান ধুয়ে জল খা গে, যা। বাজে কথা আর বলিসনে।'

পঞ্চু আর একটি কথা বললে না ; তক্ষুনি সেখান থেকে চ'লে এলো, বেশ গম্ভীর হ'য়েই। সেদিন আর দু-জনের দেখা হ'লো না। পরের দিন পঞ্চু একটা চিঠি লিখলে মণ্টুকে :

মণ্টু,

তুমি এই দু-আনিটি অবশ্য গ্রহণ করো। নয়তো আমি অত্যন্ত দুঃখিত হবো।

চিঠিটা, আর একটা দু-আনি, খামে ভ'রে পঞ্চু চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিলে মণ্টুর কাছে। খানিক পরেই সে জবাব নিয়ে এলো। মণ্টু লিখেছে—

পঞ্চু,

তোমার দু-আনি ফেরৎ পাঠাচ্ছি ; আবার যদি এ-বিষয়ে কিছু বলো, অত্যন্ত অপমানিত বোধ করবো—ব'লে দিলাম।

খামের ভিতর সেই দু-আনি।

রাগে পঞ্চুর সর্বশরীর জ্ব'লে গেলো। ওঃ, উনিই ভারি মানী লোক এসেছেন, জিনিশের দাম নিতে পারেন না! আর আমার যেন একটা আত্মসম্মান নেই।

সেদিন আর সে মণ্টুর বাড়ি গেলো না, মণ্টুও এলো না। দু-তিন দিন এমনি গেলো। তারপর পঞ্চু আর-একখানা চিঠি লিখলে:

মণ্টু, আমি তোমাকে স্পষ্ট ক'রে জানাতে ইচ্ছা করি যে কারো কাছে ঋণগ্রস্ত হ'য়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং তুমি এই দু-আনা গ্রহণ ক'রে আমাকে বাধিত করবে।

মণ্টু জবাব দিলে:

তুমি ফের যদি আমাকে এ-রকম অপমান করবে তাহ'লে জীবনে আর তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।

হোঃ! না বললেন কথা তো ব'য়ে গেলো। মস্ত রাজা-উজির মনে করেন কিনা নিজেকে! দয়া ক'রে এক বাক্স ক্লিপ দিয়ে গরিবকে ধন্য করতে হবে না। নিতেই হবে ওঁকে পয়সা।

এর পরে পঞ্চু যে-চিঠি লিখলে তা এই:

'মহাশয়,

আপনি আমার জন্য কলিকাতা হইতে যে ক্লিপের বাক্স আনিয়াছিলেন, তাহার মূল্য গ্রহণ করিতে আপনি আইনত, ন্যায়ত ও ধর্মত বাধ্য। আমি আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী নই। আপনার নিকট হইতে বিনামূল্যে কোনো দ্রব্য গ্রহণ করিতে আমার আত্মসম্মান আহত হয়। আপনি এই দুই আনা গ্রহণ না করিলে বুঝিব আপনি আত্মম্ভরী ও স্বার্থপর, এবং আমার পক্ষে আপনার এই হীনতায় স্তম্ভিত হওয়া ব্যতীত উপায় থাকিবে না। ইতি

নিবেদক

পঞ্চানন দাস'

এ-চিঠির উত্তর এলো এই :

'মহাশয়,

আপনার পত্র পাইলাম। আপনি অতি ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি, আপনার নিকট হইতে বহু অপমান আমি সহ্য করিয়াছি, কিন্তু এইবার সীমা টানিবার সময় আসিয়াছে। আপনি কি মনে করেন আমি সামান্য দু-আনা পয়সার কাঙাল? না কি, এই পয়সার লোভেই কলিকাতা হইতে ঐ ক্লিপের বাক্স আনিয়াছিলাম? আপনার ঐ মুদ্রা আমি ফিরাইয়া দিতেছি, যদি সহস্রবার প্রেরণ করেন, সহস্রবারই ফেরৎ দিব, কেননা আমি ভদ্রলোক। আপনি যদি ভদ্রলোক হইতেন তাহা হইলে পুনঃপুনঃ আমাকে এইভাবে বিরক্ত ও অপদস্থ করিতেন না।

ইতি

নিবেদক

মণীন্দ্রনাথ সরকার'

এর পর থেকে দু-জনের আর মুখ-দেখাদেখি নেই।



কান্তিকুমারের নার্ভাস ব্রেকডাউন

দ্বিতীয়বার এম.-এ. পাশ ক'রে কান্তিকুমার বললে, 'আর পারিনে!'

আমি বললাম, 'তবু তোমার মুখে একটা কথা শুনলাম। আমরা তো ভেবেছিলাম পরীক্ষা পাশ করতে-করতেই তুমি বুড়ো হ'য়ে যাবে।'

কান্তিকুমার বললে গম্ভীর মুখে : 'না···সে কথা নয়। পরীক্ষা পাশ করা যেমন-তেমন, শরীরটাই জুৎসই লাগছে না। বড় টায়ার্ড লাগে সব সময়।'

'এখন কিছুদিন প্রাণ ভ'রে জিরিয়ে নাও—খাওয়া আর ঘুম—'

শেষের কথাটা শুনে কান্তিকুমারের মুখে চোখে এমন একটা যন্ত্রণার ভাব ফুটে উঠলো যে আমি মনে করলাম কী হ'লো। শরীরটাকে সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের মত মুচড়িয়ে হাত শূন্যে তুলে সে বললে, 'ঘুম! ঘুমোতে পারি না এক ফোঁটা। কাকের মতো তাকিয়ে সারা রাত কাটে।'

আমি বললাম, 'তাই নাকি?'

'তাই নাকি!' আমার এই মন্তব্যে কান্তিকুমার রীতিমত রেগে উঠলো। 'তোমরা তো চাষা-ভুষোর মতো সমস্ত রাত প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোও—তোমরা এর কী বুঝবে! কী যে কষ্ট—উঃ! ঘুম হয় না, খেতে পারি না, কেউ কিছু বললেই খেঁকিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। মাথায় যেন সর্বসময় আগুন জ্বলছে!'

তখন বললে নীরেন, 'তাই তো, লক্ষণগুলো তো ভালো নয়। এ থেকে সীরিয়স কিছু হ'তে পারে যে-কোনোদিন।'

এ কথা শুনে কান্তিকুমার একটু যেন খুশিই হ'লো। ছোটো টেবিলটার উপর পা তুলে দিয়ে বললে, 'ওঃ, এ কিছু নয়। নার্ভাস ব্রেকডাউন।'

কথাটা শুনে আমি আর নীরেন একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম।

কান্তিকুমার তার চোখা নাকের ডগাটা কয়েকবার চুলকে একবার আমার, একবার নীরেনের মুখের দিকে তাকালো।—'কাকে বলে নার্ভাস ব্রেকডাউন জানো তো?'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'তা জানিনে! এই তোমার যা হ'য়েছে আর কি। পর পর দু-বার এম.-এ. পাশ করলে ও-রকম হয় অনেক সময়।'

তখন কান্তিকুমার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আর-একবার বললে, 'আর পারিনে।'

আমি আস্তে বললুম, 'ডাক্তার দেখিয়ে কোনো ওষুধ-টষুধ—'

'ধুত্তোর ওষুধ!' কান্তিকুমার পায়ের নিচে টেবিলটাকে এমনভাবে নাচাতে লাগলো যে আমার ভয় হ'লো কখন ওটা উল্টিয়ে পড়ে। 'এই যে বোতল-বোতল টনিক খেলাম, কী হ'লো? বিজ্ঞাপনের আদ্ধেক কথা সত্যি হ'লেও এতদিনে আমি মহাভারতের কোনো মহাবীর হ'য়ে যেতাম। অথচ—এই তো ছাখো! এই নার্ভের জ্বালাতেই একদিন আমি মরবো—হেই!'

টেবিলটা কাৎ হ'য়ে প্রায় মেঝেতে লোটাচ্ছিলো, আমি চট ক'রে দু'হাত বাড়িয়ে ওটাকে শক্ত ক'রে ধরলুম।

'এই তো ছাখো—এক মিনিট স্থির হ'য়ে বসতে পারি না। ভেতরটা ছটফট করছে সব সময়। নার্ভস্—তা ছাড়া কিছু না।' কান্তিকুমার সোফার পিঠে হাত ছড়িয়ে গা এলিয়ে বসলো—ঠিক যেন হতাশার ছবি।

নীরেন বললে, 'এক কাজ করো। কিছুদিন বাইরে কোথাও ঘুরে এসো।'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'ঠিক কথা। কলকাতা ছাড়লেই এ-সব উৎপাতের শান্তি। প্রতিজ্ঞা করো কোনো বই নিতে পারবে না সঙ্গে।'

কিন্তু কান্তিকুমারের বেশি উৎসাহ দেখা গেলো না। ঠোঁট বাঁকিয়ে, ভুরু কুঁচকে, কপালে অনেকগুলি রেখা ফেলে সে বললে, 'ওরে বাবা, বাক্স, বিছানা, ট্যাক্সি, ইস্টেশান—' কথাটা শেষ না-ক'রে আধো কাৎ হ'য়ে পা দুটো তুলে দিলো সামনের একটা চেয়ারে।

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললুম, 'চলো না আমরাও কোথাও যাই।'

তড়াক ক'রে উঠে বসলো কান্তিকুমার, চেয়ারটা টলতে টলতে ঠাশ ক'রে পড়লো মেঝেতে। 'যাবে? যাবে তোমরা? সত্যি?'

আমি চেয়ারটা তুলে ঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে বললাম, 'বেশ তো। চলো না কোথাও বেড়িয়ে আসি তিনজনে।'

বললে নীরেন, 'চলো শিমুলতলা। সেখানে আমার মামা—'

'চলো রাঁচি। সেখানে এ সময়টা—' আরম্ভ করলুম আমি।

'না, না,' কান্তিকুমার তীক্ষ্ণ গলায় ব'লে উঠলো। 'যদি কোথাও যেতেই হয় তো পুরী। পুরী ছাড়া কোথাও যাবো না আমি। দি সী! দি সী!' বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালো সে। 'কবে যাবে? কালই যাবো। আজই চলো। ওঃ, সমুদ্রের মতো কি আর কিছু!'

সুতরাং পুরীতে যাওয়াই স্থির হ'লো। ঠিক হ'লো হোটেলে গিয়ে উঠবো এবং টাকায় যতদিন কুলোয় থেকে আসবো। খুব চুপচাপ থাকবো—সমুদ্র-স্নান আর বিশ্রাম—বেশি ঘোরাঘুরি দেখাশোনা ক'রে কাজ নেই, কান্তিকুমারের নার্ভস সারিয়ে আনাই চাই।

বিষ্যুৎবার আমাদের যাত্রার দিন।

* * *

বিষ্যুৎবার এলো।

আমরা বলেছিলাম ট্যাক্সিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একেবারে কান্তিকুমারকে তুলে নিয়ে ইস্টেশনে আসবো। কিন্তু কান্তিকুমার বলেছিলো মাথা ঝেঁকে, 'না, না, ওসব হাঙ্গামা ক'রে দরকার নেই—তোমরা চ'লে যেয়ো যে যার মতো, একটু আগেই যেয়ো।'

আমি বললাম, 'ঠিক সময়েই যেয়ো কিন্তু। আটটা ছত্রিশে পুরী এক্সপ্রেস ছাড়ে।'

কান্তিকুমার চওড়া হেসে বললে, 'আরে আমাকে কিছু বলতে হবে না।'

আমি আর নীরেন অনেকটা আগেই স্টেশনে এসেছিলাম। গাড়ি ইন করবার সঙ্গে সঙ্গে ইণ্টার ক্লাশ কামরার লম্বা বেঞ্চিতে ফিটফাট বিছানা পেতে প্রস্তুত। এখন কান্তিকুমার এলেই হয়।

আটটা বাজলো, স'আটটা বাজলো, নানারকমের মানুষে ভ'রে উঠলো গাড়ি, কান্তিকুমারের দেখা নেই। আমি আর নীরেন ব্যাকুল হ'য়ে সারাটা প্ল্যাটফর্ম কতবার যে পায়চারি করলাম।

'ও কি ভুলে গেলো?' বললে নীরেন।

'না কি ভুল ক'রে রাঁচির গাড়িতে উঠে বসলো,' বললুম আমি।

'নাকি শেষ মুহূর্তে মত বদলালো?'

'নাকি কোনো অ্যাক্সিডেণ্ট হ'লো রাস্তায়?'

শেষটায় গাড়ি ছাড়তে যখন আর মোটে পাঁচ মিনিট বাকি, দেখা গেলো কান্তিকুমারের দীর্ঘ মূর্তি, পিছনে একটা কুলি মালের ভারে

ন্থয়ে পড়েছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বললে, 'এই যে, তোমরা এসেছো।'

'বাড়ি ফেরার জোগাড় করছিলাম আর-একটু হ'লে।'

গাড়িতে ওঠা গেলো। কান্তিকুমার নিয়ে এসেছে এক প্রকাণ্ড সুটকেস, বিছানা, আর ভারি একটা কাঠের বাক্স।

'ওটাতে কী?'

কপালের ঘাম মুছে কান্তিকুমার বললে, 'বই।'

'বই? এত বই!'

'কিছুদিন থাকবো তো—কখন কোন বই পড়তে ইচ্ছে করে কে জানে। ওখানে তো কোনো বই পাওয়া যাবে না।'

'তোমাকে না প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলুম বই ছুঁতে পারবে না!'

আমি যেন কিছুই বলিনি এমনি ভাবে কান্তিকুমার বললে, 'কোনটা রেখে কোনটা নিই ভাবতে-ভাবতেই তো এত দেরি হ'য়ে গেলো। তারপর এগুলো প্যাক করাও এক কাণ্ড। বেশ হবে। সারাদিন বই পড়বো শুয়ে-শুয়ে। উঃ, কী আরাম!'

রাগ করবো না হাসবো বুঝতে না-পেরে চুপ ক'রে রইলুম।

'উঃ, যাই একটু বাইরে।'

আমি হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলুম, 'আরে করো কী! গাড়ী যে এক্ষুনি ছাড়বে।'

কান্তিকুমার হেসে বললে, 'আমি এই দরজার বাইরেই আছি। বইয়ের বাক্সটার উপর চোখ রেখো একটু।'

ব'লে সে দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নেমে গেলো। আমি সন্ত্রস্ত হ'য়ে রইলুম দরজার ধারে দাঁড়িয়ে। পাশের প্লাটফর্মে জমকালো চেহারার একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে, কারা সব যাচ্ছে, সী-অফ-করনেওয়ালাদের ভিড়।

কান্তিকুমার ওদিকে তাকিয়ে জিগেস করলো, 'কী গাড়ি ওটা?'

'ই. আই. আরের বম্বে মেল।'

'আঃ, তাই তো, তাই তো! আজ তো বেস্পতিবার—বিলেত যাচ্ছে বুঝি সব। যাই দেখে আসি একটু।'

আমি কান্তিকুমারের পাঞ্জাবির গলা ধ'রে হ্যাঁচকা টান দিলুম: 'গাড়ি তো ছাড়লো ব'লে!'

বলতে-বলতেই বম্বে মেল ছেড়ে দিলো। কান্তিকুমার ব'লে উঠলো, 'আহা-হা, অল্পের জন্যে মিস্ করলুম—'

কখন যে আমাদের গাড়িও চলতে আরম্ভ করেছিলো, বম্বে মেলের দিকে তাকাতে-তাকাতে আমি নিজেই ঠাহর ক'রতে পারিনি। যখন খেয়াল হ'লো, কান্তিকুমারকে ছাড়িয়ে চ'লে এসেছিলো। জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে হাত নেড়ে চ্যাঁচাতে লাগলুম, 'কান্তি! কান্তি!'

লম্বা ঠ্যাং ফেলে দৌড়ে এসে কান্তিকুমার দরজার হাতলটা ধ'রলো। টেনে হিঁচড়ে কোনোরকমে তুললাম ওকে। আহা—উহু ক'রে উঠলো গাড়ির অন্যান্য যাত্রীরা।

অনেকের পা মাড়িয়ে, অনেকবার ঠোকর খেয়ে কান্তিকুমার আমাদের বেঞ্চি পর্যন্ত পৌঁছতে পারলো। চিৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে বললো, 'উঃ, আমার নার্ভস্! আমার নার্ভস্!'

আমি বললুম, 'আর-একটু হ'লেই তো তোমার নার্ভের বস্তা নিয়ে প'ড়ে থাকতে—'

'উঃ, বোলো না, বোলো না,' কান্তিকুমার দস্তুরমতো কাৎরাতে লাগলো। 'বালিশ দাও একটা।'

বালিশ ইত্যাদির সাহায্যে ওকে ভালোরকম শোয়াতে যাচ্ছি, তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠলো।

'আমার বই—বইয়ের বাক্সটা আছে তো ঠিক?'

'আছে, আছে।'

কিন্তু আমার মুখ থেকে কথা বেরোবার আগেই কান্তিকুমার নিচু হ'য়ে বেঞ্চির তলায় উঁকি দিতে গেলো—তারপর উঠতে গিয়েই ঠাশ

ক'রে বাড়ি লাগলো একটা। ছিটকে দু-হাতে মাথা চেপে ধ'রে পড়ে রইলো চুপ ক'রে।

নার্ভ্‌স্‌।

প্রায় সমস্ত বেঞ্চি ওকে ছেড়ে দিয়ে আমরা দু-জন একরকম ব'সেই কাটালুম—তবু সারারাত কান্তিকুমারের ঘুম হ'লো না। ঘুম তো ওর এমনিতেই হয় না—তার উপর রেলগাড়িতে একেবারেই না। সারা রাত উশখুশ, ছটফট, উঃ—আঃ।

পুরীর হোটেলটি একেবারে সমুদ্রের উপরে, মস্ত একটি ঘর আমরা দখল করলুম। খুব ভালো লাগলো। কান্তিকুমারের বিছানা জানলার ধারে, শুয়ে-শুয়ে সমুদ্র দেখবে। দি সী! দি সী! সমুদ্রের মতো কী আর কিছু! কান্তিকুমার সমুদ্র ছাখে, সমুদ্র শোনে, সমুদ্রের ঘ্রাণ নেয়। হয় সে বারান্দায় ইজি চেয়ারে ব'সে, নয় জানলার ধারে বিছানায় মাথার, বুকের, পেটের, পায়ের নিচে বালিশ দিয়ে শুয়ে থাকে—আমাদের যেন ভালো ক'রে আর চেনেই না।

নীরেন বললো, 'এখানে এসেই তাহ'লে ভালো বোধ করছো?'

আধো-বোজা চোখে জবাব দিলে কান্তিকুমার: 'এক্সকুইজিট! ওয়াণ্ডারফুল! ডিভাইন!'

দিনটা ভালোই কাটলো। রাত্রিতে খেয়ে-দেয়েই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘুমিয়ে পড়লুম প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই।

হঠাৎ এক সময় একটা শব্দে ঘুম গেলো ভেঙে। তাকিয়ে দেখি, ঘরের কোণে লণ্ঠন জ্বলছে, আর কান্তিকুমার উব-হাঁটু হ'য়ে ব'সে মাথা নচু ক'রে কী যেন করছে।

—'কী করছো, কান্তি?'

'কে, অমল? যাক, তবু তোমাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙতে পারলো? একটা হাতুড়ি-টাতুড়ি কিছু দিতে পারো জোগাড় ক'রে?'

হাতুড়ি! বলে কী লোকটা? পাগল হ'লো নাকি? উঠে গিয়ে দেখি, এক পাটি জুতো দিয়ে তার বইয়ের বাক্সটাকে দমাদম পেটাচ্ছে।

আমি কাছে যেতেই বললে, 'দেখেছো কাণ্ডটা! হতভাগা ভুবন এমন ক'রে প্যাক ক'রেছে যেন জন্মে আর খুলতে হবে না।'

'তা এই মাঝরাত্রে খোলবারই বা কী হ'য়েছে!'

'খুলবো না! তোমরা তো এক-একজন যাঁড়ের মতো ঘুমুবে, খোঁজ-খবর রাখো কারো! সমুদ্রের শব্দ শুনতে-শুনতে আমার তো একফোঁটা ঘুম আসে না। বই-টই পড়লে তবু সময় কাটবে।' কান্তিকুমার ঠাশ ক'রে আর-একটা জুতোর বাড়ি মারলো।

আমাদের কথাবার্তায় নীরেনেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো; হঠাৎ দেখি সে ছুটে এসে ছোঁ মেরে জুতোটা কেড়ে নিয়ে গেলো কান্তিকুমারের হাত থেকে।

'বাক্সটা এখন কী ক'রে খুলি?' রীতিমতো চ'টে উঠলো কান্তি-কুমার।

'ক'যে কয়েকবার মাথা ঠোকো,' জবাব দিলে নীরেন। 'আমার ব্র্যাণ্ড নিউ জুতোটার দফা রফা করছিলে আরকি!'

কান্তিকুমার হতাশভাবে মেঝের উপর পা ছড়িয়ে ব'সে পড়লো। 'নাঃ, তোমাদের সঙ্গে আসাই দেখছি আমার ভুল হয়েছে।'

নীরেন বললে, 'নাও, আর জ্বালিয়ো না। শুয়ে থাকো গে চুপচাপ।'

'শুয়ে শুয়ে-আর আকাশ-পাতাল ভাবতে পারিনে।'

'ঘুমোতে পারো না?'

'ঘুমোবো কী ক'রে? কানের কাছে সমুদ্রের যা গর্জন!'

'আমরা ঘুমুই কী ক'রে?'

'তোমরা তো মানুষ নও, তোমরা মোষ।'

আমি বললুম, 'তা তুমি দু-দিনের জন্য আস্ত একটা ইম্পিরিয়্যাল

লাইব্রেরিই বা নিয়ে এসেছিলে কেন? দু'চারখানা আলগা বই আনলেই তো হ'তো।'

কান্তিকুমার ফোঁশ ক'রে উঠলো, 'যাওঃ! তোমাদের কোনো কথা আমি আর শুনতে চাই না।'

দু-দিন কাটলো। কান্তিকুমারের উন্নতির লক্ষণ তো দেখাই গেলো না, বরং তার ব্রেকডাউন যেন আরো বেশি ডাউনের দিকে যাচ্ছে। রাত্রে কখনোই তার ঘুম হয় না, সমুদ্র তাকে ঘুমুতে দেয় না। কেবলই অস্থির-অস্থির করে, মনে হয় যেন পাগল হ'য়ে যাবে। বইয়ের বাক্স খোলা হয়েছে, তার বিছানায় সব সময় কম-সে-কম পঁয়ত্রিশখানা বই ছড়ানো। হ'লে কী হবে, তার শান্তি নেই। একবার এ-বই তোলে, একবার ও-বই খোলে; তারপর মনে প'ড়ে যায়, যে-বইখানা থাকলে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতো, সেখানাই ভুলে আনা হয়নি।

আরো দু-দিন পরে সে বললে, 'নাঃ, আর নয়।'

'সে কী, সে কী কথা?' দস্তুরমতো চমকে উঠলুম আমরা।

'সমুদ্র থেকে না-পালালে আমি আর বাঁচবো না। রাতের পর রাত না-ঘুমিয়ে বাঁচতে পারে মানুষ! সমুদ্রকে যখন এখান থেকে সরানো যাবে না, তখন আমিই স'রে পড়বো।'

যুক্তিটা অকাট্য। তবু, আমাদের কিনা বেশ ভালো লাগছিলো, তাই আমরা বললুম, 'আরো দু-চারদিন দেখলে হয় না? এই তো এলে।'

কান্তিকুমার মাথা নেড়ে বললে, 'তোমরা ইচ্ছে হ'লে থাকো। আমি যাচ্ছি আজই। এই সমুদ্র আর সহ্য হয় না আমার।'

নীরেন বললে, 'কেন, সমুদ্রের মতো কি আর-কিছু?'

'ফাজলেমি পেয়েছো—না? তা তোমরা যা-ই বলো, আমি যাবোই আজ। বাঁচি কলকাতায় ফিরতে পারলে।'

কান্তিকুমারের মত কিছুতেই বদলানো গেলো না, সে যাবেই।

অগত্যা আমাদেরও যেতে হবে—কী আর করা। নীরেন রাগ ক'রে বলেছিলো বটে, 'যাক না ও; আমরা এসো থেকে যাই আরো কিছুদিন।' কিন্তু সত্যি-সত্যি তো আর তা হয় না, যাওয়াই ঠিক হ'লো। হোটেলের দু-জন লোক ডেকে, বকশিষ কবুল ক'রে, কান্তিকুমারের বইয়ের বাক্সটা ফের প্যাক করানো হ'লো।

নিরাপদে কলকাতায় ফিরে এলাম, এইটুকু বললেই এখন গল্প শেষ হয়।

ফেরার গাড়িতে বেশ ভিড়, কান্তিকুমারকে আমরা চেষ্টা ক'রে বাঙ্কে বিছানা পেতে দিলুম—ওখানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুবে।

কিন্তু কান্তিকুমার বললে, 'পাগল! ঘুম কাকে বলে ভুলেই গেছি। বিশেষ রেলগাড়িতে—'

'যা-ই হোক, শুয়ে পড়ো তো।'

কান্তিকুমার লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লো, আমরা দু-জন অতি কষ্টে চেপে-চুপে ব'সে ঘুমে ঢুলতে লাগলুম। ওরই মধ্যে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারতুম হয়তো, তা কান্তিকুমার ত্থাখ-না-ত্থাখ লম্বা ঠ্যাং বাড়িয়ে নেমে আসে, কাঁধের নিচে খোঁচা দিয়ে বলে, 'অমল ঘুমুলে?'

চোখটা একটু লেগে আসছিলো, মাথার ভিতরটা চন ক'রে ওঠলো আমার। কোনোরকমে ইঞ্চিখানেক জায়গা ক'রে দিয়ে বললুম, 'বোসো।'

'না, বসবো না', কান্তিকুমার দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। 'এসো একটু গল্প করি।'

তখন আমার শরীরের কি মনের ঠিক গল্প করার মতো অবস্থা নয়। 'স'রে এসো, ওখানে দাঁড়িয়ো না।'

কান্তিকুমার জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিলে। আঃ, কী হাওয়া! তোমরাই সুখী—চোখ বুজলেই ঘুম।'

'দুটো বই না বাইরে রেখেছিলে—পড়ো না!'

'পাগল! এর মধ্যে পড়া যায়!'

কথাবার্তায় বেশি উৎসাহ না-পেয়ে কান্তিকুমার ফিরে গেলো তার বাঙ্কে। খানিক পরে আবার নামলো, আবার উঠলো। এমনি চললো রাত বারোটা পর্যন্ত। গাড়িতে আর যারা ছিলো, তাকিয়ে রইলো অবাক হ'য়ে।

কটক স্টেশনে একদল নেমে গেলো। গাড়িতে জায়গা হ'লো। কান্তিকুমার নেমে এসে বললে, 'তুমি উপরে যাও, গরমে আমি ম'রে গেলাম।'

বেশ কথা! কান্তিকুমার নীরেনকে দূরে ঠেলে দিয়ে অনেকটা জায়গা নিয়ে শুয়ে পড়লো। আমি উপরে গিয়ে আরামসে ঘুম দিলুম।

বাকি রাতের কথা আর-কিছু জানি না। খড়্গপুরে ভোর হ'লো। নেমে এলুম, চায়ের অর্ডার দিলুম। কান্তিকুমারকে জিগেস করলুম, 'ঘুমিয়েছিলে?'

'থাক, থাক, এখন আর দয়া ক'রে খোঁজ নিতে হবে না।'

নীরেন ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, 'নিজে তো ঘুমোয়নি, আমাকেও ঘুমোতে দেয়নি। বলে কিনা, বলো তো জি.পি.ও.তে ক-টা ঘড়ি? বলো তো ওয়েলেসলি প্লেস কোথায়? আরো কত ছাইভস্ম মাথামুণ্ডু। জ্বালিয়ে মেরেছে।'

কান্তিকুমার গম্ভীর হ'য়ে রইলো, কোন কথা বললে না।

চায়ের পরে সবাই একটু তাজা বোধ করলুম। কান্তিকুমার দুটো-তিনটে বালিশ কাছে নিয়ে আরাম ক'রে বসবার চেষ্টা করতে লাগলো—কিছুতেই ঠিক আরাম যেন হয় না।

গাড়ি ছাড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো কান্তিকুমার: 'বালিশ, বালিশ!'

'কী? কী হয়েছে?'

কান্তিকুমার জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বললে, 'ঐ যে!'

তাকিয়ে দেখি, দূরে প্ল্যাটফর্মে প'ড়ে আছে একটি বালিশ, গাড়ি একটু স্পীড নিতেই অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

হঠাৎ আর-একটা চীৎকার শুনতে পেলাম। 'চাবি, আমার চাবি!'

নীরেনের দিকে তাকাতেই সে ব'লে উঠলো, 'আমার বালিশটাই গেছে। ওর খোলের মধ্যে আমার চাবির গোছা ছিলো যে! এখন বাড়ি গিয়ে বাক্স খুলবো কী ক'রে!'

কান্তকুমার বললে, 'আমার কী দোষ? তোমার না কার বালিশ তা কি আমি জানি? আর তার খোলের মধ্যে যে তুমি চাবি রেখেছো তা কি আমাকে বলেছিলে? আমি জানলার সঙ্গে বালিশটা ঠেকিয়ে হেলান দিতে গেছি—গাড়িটা এমন অসভ্য, ঠিক তক্ষুনি স্টার্ট না-দিলে কী হ'তো না! সেই ঝাঁকুনিতেই তো প'ড়ে গেলো। আমি বালিশ—বালিশ—ব'লে অত চ্যাঁচালাম—'

'বালিশটা তোমার মতো একটা লম্বা ঠ্যাং-ওলা মানুষ কিনা যে ডাকলেই উঠে চ'লে আসবে!' এই ব'লে নীরেন মুখ ফিরিয়ে রইলো।

এ ছাড়া অবশ্যি আমরা নিরাপদেই পৌঁচেছিলুম।

ঘুমের আগের গল্প

তরঙ্গিণীকে রয়টারের একটি জীবন্ত যন্ত্র বলতে পারো, মিনিটে-মিনিটে সে খবর উগরোচ্ছে। মনে করো সন্ধেবেলায় এক পেয়ালা চা নিয়ে বসেছি ম্যাট্রিকুলেশনের খাতা দেখতে, হঠাৎ তরঙ্গিণী এসে খবর দিলো, 'বাবা, বাবা, একটা টাম যাচ্ছে।'

আমি বললুম, 'টাম নয়, ট্র্যাম। বলো তো।'

কিন্তু ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে তরঙ্গিণী। মাথা নিচু ক'রে আরো গোটা দুই লাল পেন্সিলের দাগ কেটেছি, এমন সময় সে আবার এসে আমার হাত ধ'রে টানলো। 'বাবা—ও বাবা—শোনো!'

'কী ব্যাপার?'

'একটা টাম ওদিকে যাচ্ছে, আর-একটা টাম এদিকে আসছে।' ব'লে তরঙ্গিণী খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

আমি বললাম, 'বেশ। এখন যাও তো একটু ওদিকে। কাজ করছি।'

অনুরোধের দরকার ছিলো না, কথা শেষ ক'রেই তরঙ্গিণী দে-ছুট। ৩½ আর ৪½-এর যোগফল পাতার তলায় লিখে পাতাটি ওল্টাতেই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সে আবার এসে উপস্থিত। এবার কী খবর?

'ও বাবা, জটিবুড়ি যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, জটিবুড়ি! জটিবুড়িকে চেনো তুমি?'

স্বীকার করতে হ'লো যে চিনি না।

'আমি চিনি। আমি রো—জ দেখি ওকে। এসো, দেখবে ওকে। এসো না।'

আমি বললাম, 'রঙ্গি, লক্ষ্মী তো, আমার এখন কাজ আছে।'

'জটিবুড়ির ম—স্ত লম্বা চুল। জানো, ও পাগল হ'য়ে গেছে। খেতে দিলেও খায় না।'

হাতের খাতাখানা শেষ ক'রে কপালের ঘাম মুছলাম। এই খাতা দেখা এক কাজ! যা সব ভুল লেখো তোমরা!

একমনে ব'সে খানতিনেক খাতা দেখে ফেলেছি, পাশের ঘর থেকে তরঙ্গিণীর উল্লাস-ধ্বনি মাঝে-মাঝে কানে আসছে। চতুর্থ খাতাখানা টেনে নিয়ে সবে খুলেছি, তরঙ্গিণী একেবারে দাপাতে-দাপাতে আমার গায়ে এসে আছড়ে পড়লো।

'ছাখো তো বাবা—মনা আমাকে জুতো বুরুশ করতে দিচ্ছে না!' রাগে দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলে আরকি বেচারা।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'এই মনা—তুই ওকে জুতো বুরুশ করতে দিচ্ছিস না যে?'

মনা নামটা হনুমানের অপভ্রংশ নয়, যদিও হ'লে মানাতো। চোখ মিটমিট ক'রে নাকি সুরে সে বললো, 'দেখুন তো বাবু, ও আমাকে কিছুতেই কাজ করতে দিচ্ছে না। কেবল বুরুশ কেড়ে নিচ্ছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই করবে। মনা, ওর হাতে বুরুশটা দে।'

তরঙ্গিণীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখ ভেংচিয়ে এই দশমবর্ষীয় দুর্দান্ত বালক দিলো দৌড়। আর তরঙ্গিণীও ছুটলো পিছন-পিছন সরবে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে।

তারপর খানিকক্ষণ হুলুস্থুল। তার বিস্তারিত বর্ণনায় কাজ নেই, কারণ তাহ'লে তোমাদের সন্দেহ হ'তে পারে যে বাইরে থেকে তরঙ্গিণীকে যতটা লক্ষ্মী মনে হয়, আসলে হয়তো তিনি তা নন।

ততক্ষণে আমি পুরো দশখানা খাতা দেখে ফেলেছি, আর তার ফলে আমার চোখ টনটন, আর হাত কনকন করছে, আর মাথার মধ্যে আওয়াজ দিচ্ছে ভোঁ-ভোঁ। এ-দিকে আর মোটে পনেরো দিন সময় হাতে আছে, পাহাড় প'ড়ে আছে এখনো। বানান ভুল কাটতে-কাটতে পেন্সিলটা ভোঁতা হ'য়ে গিয়েছিলো; সেটা শানিয়ে নিয়ে আবার খাতা আক্রমণে উদ্যত হলাম।

ঠিক তক্ষুনি তরঙ্গিণী হুড়মুড় ক'রে আমার গায়ের উপর এসে পড়লো। ফোঁপাবার মতো আওয়াজ ক'রে বললে, 'বাবা, মনার সঙ্গে আমি আর কথা বলবো না।'

'কেন, কেন, মনার কী দোষ?'

'ও আমাকে বকেছে। ও পাজি, ও দুষ্টু, ও দরজা—'

'দরজা কেন?'

আমার এ-প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না তরঙ্গিণী।—'আড়ি, আড়ি। মনার সঙ্গে আড়ি। আর কোনোদি—ন ওর সঙ্গে কথা বলবো না।'

'বেশ তো, বোলো না। এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো ভাত খেয়ে নাও দেখি। তারপর—ঘুমুবে।'

'না, বাবা, আমি আজ খাবোও না, ঘুমুবোও না, কিচ্ছু করবো না।'

'কিচ্ছু করবে না?'

'তোমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, কেমন? কিচ্ছুতে হাত দেবো না। আমি কি কোনোদিন তোমার টেবিল ধরি?'

একটা বীভৎস বানান ভুলের উপর এত জোরে পেন্সিল টানলাম যে মটাং ক'রে শিষটাই গেলো ভেঙে। বিরক্ত হ'য়ে আবার পেন্সিল কাটছি, তরঙ্গিণী বললো, 'তোমার ঐ পেন্সিলটার কাজ হ'য়ে গেলে দিয়ে দেবে আমাকে?'

'এখান থেকে যাও, রঙ্গি, মা-র কাছে যাও।'

'বাবা, একটুখানি তোমার কোলে বসবো ! বসি ?'

নাঃ, জ্বালালে মেয়েটা। ওকে কোলে নিয়েই খাতাটার পাতা ওল্টালাম।

'বাবা, জানলার কাচে ওটা কী দেখা যাচ্ছে বলো তো ?'

'তুমিই বলো।'

'চাঁদ ! চাঁদ উঠেছে, বাবা। ছাখো না—ছাখো না তাকিয়ে !' তরঙ্গিণী আমার গাল ধ'রে মুখ ফেরাবার চেষ্টা করলো।

'বাঃ, সত্যি তো।'

'না, ভালো ক'রে দেখলে না। ঐ যে ছাখো !'

'হুঁ।'

'আচ্ছা বাবা, তুমি চাঁদ ধরতে পারো ? বলো না, বাবা। পারো ?'

'না, পারি না।'

'কেন পারো না ?'

'চাঁদ তো কত উঁচুতে—আমি কেমন ক'রে ধরবো, বলো তো ?'

'কেন ? তুমি তো বড়োই হয়েছো ; আমার মতো তো আর ছোটো নেই। তুমিও পারো না ?'

৭, ৫, আর ১৮ইর একটা যোগফল সেরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। 'রঙ্গি, একটু নাম না রে কোল থেকে। তোর মা কোথায় ?'

'না, বাবা, আমি তোমার কাছেই থাকবো। লারু-মামা পারে ?'

'কী পারে ?'

'চাঁদ ধরতে ?'

হেসে বললাম, 'না, লারু-মামাও পারে না।' তরঙ্গীর এই মামাটি প্রায় ছ-ফুট লম্বা এবং ভাগনির চোখে পৃথিবীর উচ্চতম মানুষ।

'লারু-মামাও পারে না ? হাত বাড়ালেও না ? চায়েরে উঠে দাঁড়ালেও না ?'

'না, কিছুতেই পারে না। আর, রঙ্গি—ওটা চায়ের নয়, চেয়ার।'

'তবে কি চাঁদ ধরাই যায় না?'

'যায়, খু—ব লম্বা একটা আঁকশি যদি পাও।'

'আঁকশি কাকে বলে, বাবা?'

'আছে একরকম জিনিশ।'

'তা দিয়ে চাঁদ ধরা যায়?'

'চেষ্টা করতে পারো।'

'আমাকে একটা আঁকশি কিনে দিয়ো বাবা—দিয়ো? আমি তা দিয়ে চাঁদ ধরবো।'

'কিন্তু অত লম্বা আঁকশি তো কিনতে পাওয়া যাবে না। ফরমাশ দিতে হবে।'

'তবে ফরমাশই দাও।'

'কিন্তু ও তো একদিনে দু-দিনে তৈরি হবে না, অনেক দিন লাগবে।'

'অনে—ক দিন? চোদ্দ, বারো, ছত্রিশ, পনেরো দিন?'

'তার চেয়েও বেশি! বছর দশেক তো লাগবে।'

'দশ বছ—র! না, তারও বেশি! সাত বছর, সাত বছর লাগবে, বাবা।' খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো তরঙ্গিণী।

এই সুযোগে আমি আর-একবার বললাম—'রঙ্গি, লক্ষ্মী তো, একটু নামো কোল থেকে। দেখে এসো তো মা কী করছেন।'

তরঙ্গিণী যেন শুনতেই পেলো না কথাটা।—'আমাকে আঁকশিটা দিয়ো, বাবা। বলো দেবে!'

'বেশ! ব'লে দেবো ওদের একটা আঁকশি বানাতে।'

'কাদের বলবে?'

'যারা এ-সব বানায়।'

'খুব, খুউউব, খুউউউউব লম্বা হবে তো?'

'তা হবে।'

'তখন আমি সেটা দিয়ে চাঁদ ধরবো, চাঁদ ছোঁবো, হাতে ক'রে পেড়ে আনবো—না বাবা?'

'সে তো অনেক পরের কথা। আগে আঁকশি তৈরি হোক। এখন তো ওরা প্রাণপণে ছুটছে কোথায় খুব লম্বা-লম্বা বাঁশ আছে, তারই খোঁজে।'

'বাঁশ দিয়ে কী হবে, বাবা?'

'বাঃ, হাজার হাজার হাজার বাঁশ জোড়া দিয়ে-দিয়ে তবে তো আঁকশি!'

'হাজার হাজার হাজার হাজার! সে কত, বাবা?'

'সে অনে—ক। ওরা সব ছুটেছে বাঁশের খোঁজে,—কেউ গেছে নোয়াখালি, কেউ মানিকগঞ্জ, কেউ ডায়মণ্ড হার্বার, কেউ বর্ধমান। দেশে যত বাঁশ আছে সব চাই।'

'স—ব চাই?'

'কোথায় নেত্রকোনা, কোথায় পিরোজপুর, কোথায় তমলুক, কোথায় হবিগঞ্জ, হাজার-হাজার লোক শুধু বাঁশই কাটছে। দিন-রাত খটখট ঘটাং ঘটাং—ধুলো উড়ছে মেঘের মতো, বালতি-বালতি ঘাম ঝরছে মাটিতে, বাঁশঝাড়ের পর বাঁশঝাড় উজোড় হ'য়ে গেলো, তবু কি কাজ ফুরোয়! বাঁশের স্তূপ যতই জ'মে ওঠে, ততই কনট্রাক্টর অপাঙ্গ দস্তিদার মাথা নেড়ে বলেন—না, না, হয়নি, হয়নি, আরো চাই।'

'তারপর, বাবা?'

'খট খট ঘটাং ঘটাং আর থামে না। দেশের লোকের কানে তালা লাগবার জোগাড়। কী ব্যাপার? মস্ত আঁকশি তৈরি হবে, তরঙ্গিণী তা দিয়ে চাঁদ পাড়বেন। এক বছর যায়, দু-বছর যায়—এইভাবে পাঁচ বছর যখন কাটলো, তখন অপাঙ্গ দস্তিদার সাত কোটি চার লক্ষ পনেরো হাজার তিনশো একুশখানা বাঁশ বত্রিশবার গুনে দেখে, তারপর বললেন—হ্যাঁ, এইবার হয়েছে। আরে বাবা—সে

গোনাই কি সোজা নাকি! গুনতে পুরো সাতটি মাস লেগেছিলো, আর কলকাতা থেকে, লক্ষ্ণৌ থেকে, হায়দ্রাবাদ থেকে, বরানগর থেকে, ষোলো জন নামজাদা ম্যাথমেটিক্সের প্রোফেসর পঞ্চান্ন রীম কাগজ আর দু-শো সাতান্নটি পেন্সিল নিয়ে হিশেব করেছিলেন।—ঈশ, কী যাচ্ছেতাই লেখে!'

'কী বললে, বাবা?'

'কিছু না।'

'তারপর তৈরি হ'লো আঁকশি?'

'আছো কোথায়? আঁকশি তৈরি হওয়া এত সোজা কিনা! মোটে তো এতক্ষণে বাঁশ জোগাড় হ'লো। সেগুলোকে চালান দিতে হবে না? নীলফামারি থেকে, ঝালকাঠি থেকে, মালদ, পোড়াদ লাকশাম নবিনগর হবিগঞ্জ থেকে রোজ হাজার-হাজার বাঁশ কলকাতায় আসছে গোরুর গাড়িতে, মোটর-লরিতে, নৌকোয় ইস্টিমারে, রেল-গাড়িতে, আসছে মানুষের, মোষের, হাতির, উটের পিঠে—এমনি ক'রে-ক'রে মাত্র এক বছরের মধ্যেই সমস্ত বাঁশ খিদিরপুরের প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরিতে এসে জড়ো হ'লো।'

'তারপর, বাবা?'

'তারপর? আরে এখনই তো আসল কাণ্ড আরম্ভ। ওঃ, সে কী কাণ্ড! চোদ্দ মাইল জোড়া ফ্যাক্টরি, চল্লিশ হাজার লোক অষ্ট-প্রহর খাটছে, হুগলি হাওড়া চব্বিশ পরগনা জেলায় বেকার আর কেউ থাকলো না। ছ-মাস পরে আমেরিকা থেকে নতুন একটি যন্ত্র এলো, সঙ্গে-সঙ্গে চাকরি গেলো তিন হাজার জোয়ানের। আবার আরো দু-মাস পরে জর্মনি থেকে আরো একটি বিরাট যন্ত্র যেই পৌঁছলো, সেটা চালাবার জন্য চার হাজার লোকের চাকরি হ'লো তক্ষুনি।'

'তবু আঁকশি তৈরি হ'লো না?'

'এই হচ্ছে এবার। লোহা এলো, তামা এলো, প্লাটিনাম এলো,

মালগাড়ি বোঝাই নানান রঙের বিদঘুটে গন্ধের ওষুধ এলো ; তিন-জন বিজ্ঞানী এলেন জাপান থেকে ; চেকোশ্লোভাকিয়ার কেমিক্যাল ফ্যাক্টরির ম্যানেজারকে ডবল মাইনে দিয়ে নিয়ে আসা হ'লো তদারক করতে। রাজ্যি ভ'রে হুলুস্থূল ! কী ব্যাপার ? আঁকশি তৈরি হচ্ছে, তরঙ্গিণী চাঁদ পাড়বেন। খবর-কাগজে, রেডিওতে, ট্র্যামে, বাস্-এ, চায়ের দোকানে, এ-ছাড়া আর কথা নেই।'

'আমার আঁকশি—না, বাবা ?'

'হ্যাঁ, তোমারই তো।'

'আরো কি অনেকদিন লাগবে শেষ হ'তে ?'

'এই তো হ'য়ে এলো। এক বছর যায়, দু-বছর যায়, তিন বছর যায়, ঠিক সাড়ে-চার বছর আঠারো দিন একুশ ঘণ্টা পরে একদিন বাংলা, হিন্দি, তামিল, মারাঠি, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জর্মান, রুশ, চীনে, জাপানি, আরবি, হিব্রু—পৃথিবীর সমস্ত খবর-কাগজে মস্ত হরফে খবর বেরোলো—

আশ্চর্য আবিষ্কার !

পৃথিবীর দীর্ঘতম আঁকশি

মানুষের হাতে চাঁদের গ্রেপ্তার

বঙ্গবালিকার অদ্ভুত কীর্তি

—আর তার তলায় খুদে অক্ষরে মস্ত গল্প ছবি-সুদ্ধু ছাপানো। আর তারপর একদিন মহাসমারোহে এঞ্জিনিয়ার কনট্র্যাক্টর ম্যানেজর রাসায়নিক জ্যোতির্বিদ গণিতবিদ—সবাই মিলে তরঙ্গিণীর কাছে এসে হাজির হ'লো।

"'কী—কী ? ব্যাপার কী ?"

"'আঁকশি প্রস্তুত ! এবার তুমি চাঁদ ধরতে পারবে।"

'শুনে তরঙ্গিণী খিলখিল ক'রে হেসে ছুটে পালালো সেখান থেকে, কেননা ততদিনে সে বেণী দুলিয়ে স্কুলে যায়, পরের বছর ম্যাট্রিকুলেশন দেবে। হাসতে-হাসতে পেটে তার খিল ধ'রে গেলো —ও মা চাঁদ নাকি আবার ধরা যায়!···রঙ্গি রঙ্গি! এই রে, মুশকিল হ'লো! না-খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লো মেয়েটা!

* * *

তরঙ্গিণী তো ঘুমোলো, কিন্তু গল্প তবু ফুরোলো না। আরো একটু আছে, আমার ম্যাট্রিকুলেশনের খাতা এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু তাও একদিন শেষ হ'লো, আর তার মাসখানেক পরে বেজায় ভারিক্কি চেহারার লম্বা খামের একখানা চিঠি এলো আমার নামে। তাতে লেখা:

প্রিয় মহাশয়,

আপনার প্রেরিত ম্যাট্রিকুলেশনের খাতাগুলির বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আপনি একটি খাতায় ৩½ আর ৪½ এর যোগফল বসিয়েছেন ৭ অন্য একটিতে ৭, ৫, আর ১৮½র বসিয়েছেন ২৮½, অন্য একটিতে ২ আর ৩-এ ৪ যোগ ক'রেছেন। এ-রকম আরো আছে। এ অবস্থায় ভবিষ্যতে এ-রকম দায়িত্বপূর্ণ কাজ আপনার চেয়ে যোগ্যতর কোনো ব্যক্তির হাতেই···'

চিঠিটা শেষ-পর্যন্ত আর পড়লুম না।

———



হারান-জ্যাঠা ও সুজিত-দা

আমাদের হারান-জ্যাঠার গলা পেলেই আমরা দিগ্বিদিকে ছিটকে পড়ি, যে যেখানে পারি লুকোই। কেন? মানুষ কি তিনি ভালো নন? মেজাজ কি তাঁর তিরিক্ষি, না, হাতের মুঠো আঁটো, নাকি তিনি সেই ভীম-গম্ভীরদের একজন, ছোটোদের যাঁরা মানুষ ব'লেই ভাবেন না? ঠিক উল্টো;—আমাদের হারান-জ্যাঠার মতো ভালোমানুষ আর হয় না—যদিও দাড়ি রেখে খামকা মুখখানাকে জবড়জং ক'রে রেখেছেন, তবু ঐ কাঁচা-পাকা দাড়ির ফাঁকে-ফাঁকেই হাসি তাঁর চুইয়ে পড়ছে সব সময়, আর ছোটোদের তিনি এত ভালোবাসেন যে জীবনটা বলতে গেলে তাদেরই উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন। আর আমাদের যা ভালোবাসেন তা তো বলবারই নয়, মোটা-মোটা চকোলেট আনতে ভোলেন না একদিনও, ছুতো পেলেই সিকি-আধুলি বিলোন।—তবে?

অবশ্যি যেখানেই লুকোই, যেমন ক'রেই ছিটকে পড়ি, আমাদের তিনি খুঁজে বের করবেনই। আমি বয়সে বড়ো, আবার পড়াশুনোতেও ভালো, তাই আমার উপরেই তাঁর ঝোঁক বেশি; কিন্তু ডলু-বুলুরও নিস্তার নেই—এমনকি, চার বছরের চিত্রা, এই সেদিন মোটে যে ক-অক্ষর চিনলো, তাকে নিয়েও চেষ্টা করেন মাঝে-মাঝে। আর আমরাও শেষ পর্যন্ত ধরা না-দিয়ে পারি না—চকোলেটটা আছে তো! চকোলেট আবার তক্ষুনি, তাঁর সামনেই খেতে হবে—তাতে অবশ্যি আপত্তি নেই আমাদের;—নিঃশব্দে হাসেন কাড়াকাড়ি ক'রে খাওয়া দেখতে-দেখতে, আর খাওয়া হ'য়ে গেলে—দুঃখের বিষয় সেটা বড়ো

অল্প সময়েই হ'য়ে যায়—মুখ টিপে বলেন, 'কী? কী পড়া-টড়া হচ্ছে?'

রোজই বলেন এই কথা, ভাবটা এইরকম, যেন এটা একটা মস্ত হাসির কথা। আমি বলি, 'আপনার "ভূগোলভঙ্গিমা"খানা আবার পড়ছিলাম—'

'ঐটে তোর বড্ড ভালো লাগে!' একগাল হাসেন হারান-জ্যাঠা। 'আচ্ছা, কোন জায়গাটা তোর সবচেয়ে ভালো লাগে বল তো?'

আমি চুপ ক'রে থাকি, খুব যেন ভাবছি।

'সেই যেখানে নদীর কথায় বলা আছে, "নদী অচল-চঞ্চলের মিলন-সেতু। অচল পর্বতে তার জন্ম, চঞ্চল সমুদ্রে তার অবসান। নদী তাই একাধারে গতিশীল ও শান্ত। পর্বতকে মানুষ পূজা করে, সমুদ্রকে মানুষ প্রণাম করে, কিন্তু নদীকে মানুষ ভালোবাসে।—" আধো চোখ বুজে নিজের বই থেকে আউড়ে যান—এ-রকম অনেক-অনেক কথাই তাঁর সড়োগড়ো মুখস্থ—তারপর পুরো চোখ খুলে বলেন, 'এখানটা তো?'

'ঠিক এখানটাই,' জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না আমার।

'কত বড়ো একটা ভাববার বিষয়! শুধু নদীর কথা ভাবলেই কত শিক্ষা হয় আমাদের।—আর তোরা, ডলু-বুলু?'

বুলু বলে, 'আপনার "স্বাস্থ্যসিদ্ধি"তে এমন সব—' আর তার কথা শেষ হবার আগেই ডলু কবুল করে, 'আমার কিন্তু "স্বাস্থ্যসিদ্ধি"র চেয়েও ভালো লাগে—"পদার্থপরীক্ষা"।'

'কার যে কোনটা ভালো লাগে!' হারান-জ্যাঠার দাড়ি-ভরা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের প্রত্যেকের দিকে এক-একবার তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত আমার উপরেই চোখ রাখেন—'তোর তো "বিশ্ববীক্ষা"টাও খুব পছন্দ!'

'ওঃ!' আমি লাগসই আওয়াজ করি।

হারান-জ্যাঠা দাড়িতে হাত বুলোন, মিটিমিটি হাসেন।—'দাঁড়া—এবার যা-একখানা লিখছি!'

'কী, জ্যাঠামশাই? কী?' কোরাসে ব'লে উঠি আমি আর ডলু আর বুলু।

'দেখবি, দেখবি!···শুধু ভাবছি—বিষয়টা বড়ো শক্ত নিয়েছি এবার—তোদের বুঝতে না অসুবিধে হয়!'

'ওমা! অসুবিধে কেন?' ডলু বলে, সরলভাবে।

'আচ্ছা,' হারান-জ্যাঠা গম্ভীর হন এবার, 'তোদের কি একটু—শক্ত লাগে আমার বই?'

'না জ্যাঠামশাই, একটুও না!' বুলু ব'লে ওঠে, পাখির গলায়।

'না-হ'লেই বাঁচি। আর-কিছুর জন্য তো না—তোদের জন্য, দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যই তো লিখি আমি। আর তোদেরই যদি বুঝতে কষ্ট হয়—'

আমি বলি, 'তা একটু কষ্ট না-করলে কি আর শিক্ষা হয়?'

'ঐ তো!' হারান-জ্যাঠার মুখ আনন্দে গ'লে যায়—'এই কথাটাই তো বুঝতে চায় না আজকালকার ছেলেমেয়েরা। ঐ-যে সব চকচকে রংচঙে অন্তঃসারশূন্য গল্পের বই—কী বলে গিয়ে—হাসির গল্প, ভূতের গল্প, আর যত রাজ্যের আজগুবি অ্যাডভেঞ্চার—ও না-হ'লে আর মন ওঠে না তাদের!—' হঠাৎ একটু থেমে সরু-গলায় বলেন—'তোরা ও-সব পড়িস-টড়িস না তো?'

'আমরা—!' এমন একটা অসম্ভব কথাকে আমি হেসেই উড়িয়ে দিই।

'তোদের যা-ই হোক ভালো লাগে এ-সব—তাতে আমার উৎসাহ হয়। হয়তো তোদের মতো আরো ছেলেমেয়ে আছে দেশে।'

'আছে না!' আমিও উৎসাহিত হ'য়ে উঠি সঙ্গে-সঙ্গে—'এই-তো আমাদের ক্লাশের হিস্ট্রির ফার্স্ট বয়কে আপনার বইয়ের কথা বলতেই সে তক্ষুনি কিনতে ছুটলো।'

'আরে না, না—কিনবে কেন—আর কোথায়ই বা কিনবে—তোকে একসেট পাঠিয়ে দেবো তার জন্য—' বলতে-বলতে হঠাৎ থামেন, কোটের প্রকাণ্ড পকেটে হাত দিয়ে ব'লে ওঠেন—'এই যে, পকেটেই রয়েছে দেখছি—এই "বিশ্ববীক্ষা", আর "জীবাণু-জীবন"—অন্যগুলো পাঠিয়ে দেবো ও-বেলা—আর, ছেলেটিকে একদিন নিয়ে আসিস না আমার কাছে।'

আমি বই দু-খানা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞভাবে দাঁড়িয়ে থাকি।

হারান-জ্যাঠা আবার বলেন, 'আর-কোনো ছেলে যদি এ-রকম—আর বুলু, তোকেও বলা রইলো, তোদের স্কুলের কোনো মেয়ে যদি—বুঝিস তো, যার ভালো লাগে, তাকে দিতে কত ভালো লাগে!'

'আপনি কিন্তু বড্ড বিলিয়ে দেন অমন ভালো-ভালো বইগুলো,' ডলু আপত্তি তোলে।

'আরে বুঝিস না—পড়তে চাওয়াটাই তো বইয়ের দাম!' মাথা কাৎ ক'রে হেসে ওঠেন হারান-জ্যাঠা, চোখ টিপে তাকান ছোট্ট চিত্রার দিকে—'এটার খুব বুদ্ধি হবে, আমি ব'লে দিচ্ছি! কী চকচকে চোখ! —দুষ্টুটা!' ব'লে চিত্রার মাথায় টোকা দেন।

'সত্যি, জ্যাঠামশাই!' বুলু গোল-গোল চোখে খবর দেয়, 'চিত্রাটা খুব—! আজ সকালেই আপনার "নক্ষত্রতত্ত্বে"র পাতা ওল্টাচ্ছিলো ব'সে-ব'সে!'

'বলেছি না! ও যা হবে একটি!' এবার সুখের সমুদ্রে ভাসতে থাকেন হারান-জ্যাঠা।

—ঐ তাঁর বাতিক! দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য জীবনটা বিলিয়ে দেবেন তিনি। দিনের বেলা আপিশ করেন, আর রাত জেগে-জেগে লেখেন—তারপর নিজেই ছাপান ছোটো-ছোটো অক্ষরে চটি-চটি বই;—কোনো দোকানে নেয় না—বাড়িতেই বাণ্ডিল ক'রে-ক'রে রাখেন সব—আর চেনাশোনা সব বাড়ি ঘুরে-ঘুরে প্রত্যেকটি

ছেলেমেয়ের হাতে একখানা ক'রে দিয়ে আসেন। শুধু এটুকু হ'লে মুশকিল ছিলো না—কিন্তু না!—হারান-জ্যাঠা এখানেই থামেন না, সব বাড়িতে নিয়ম ক'রে তাঁর যাওয়া চাই—আর গিয়েই বসবেন ছোটোদের মহলে—'পড়েছিস? কেমন লাগলো? ভালো লাগলো? কোনটা ভালো লাগলো?'—একবার তাঁর হাতে পড়েছো কি গিয়েছো তুমি! এদিকে এমন ভালোমানুষ, এত চকোলেট-টকোলেট দেন—তাই বলতেই হয়—যে-রকম আমরা ব'লে থাকি, সে-রকম কথা বলতেই হয়। উনি যা শুনতে চান, যা শোনবার জন্য ঘন-ঘন আসেন, সেটা মুখেও এসে পড়ে খুব সহজে—উনিই বলিয়ে নেন আমাদের দিয়ে—আর এখন বলতে-বলতে অবশ্য চমৎকার অভ্যেস হ'য়ে গেছে আমাদের। তা আর কী—কারো তো আর কিছু এসে যাচ্ছে না এতে!—একটু শুধু অসুবিধে আমাদের এই যে ওঁর "বিশ্ববীক্ষা" আর "পদার্থপরীক্ষা" আর "নক্ষত্রতত্ত্ব" আর হ্যানো-ত্যানো হাবিজাবি সমস্ত—ও-সব যে মেঝেতে ছড়ায় আর ধুলোতে গড়ায় আর চাকররা পায়ে-পায়ে মাড়ায়, আর শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরের উনুনে নির্বাণ লাভ করে, এটা পাছে হঠাৎ তাঁর চোখে প'ড়ে যায়, সেজন্য সাবধান থাকতে হয় রীতিমতো; আর আমাদের হাসির, ভূতের, অ্যাডভেঞ্চারের বইগুলো লুকিয়ে-লুকিয়েই রাখতে হয় ওঁর জন্য—আর আমরা কি আর তত ছোটো আছি এখনো যে ও-সবই পড়বো?—আমি তো না!—আমি শরৎবাবুর গল্প ধ'রে ফেলেছি।

হারান-জ্যাঠা আমার বাবার পিসতুতো দাদা, কিন্তু আরেকজনের তিনি সাক্ষাৎ জ্যাঠামশাই, আমাদের সুজিত-দার। এম. এ. পড়েন সুজিত-দা, লম্বা কোঁচা আর ওল্টানো চুলে ফিটফাট বাবু। তিনিও আসেন মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়িতে—আর যদিও এতদিনের মধ্যে অনেক চেষ্টার ফলে বুলুটা একবার মাত্র তাঁর কাছে আদায় করতে পেরেছিলো চার পয়সার লজেঞ্চুষ, তবু তিনি এলেই আমাদের মধ্যে ফুর্তির ধুম প'ড়ে যায়। সুজিত-দা এসে বসেছেন কি আমরা গোল

হ'য়ে ঘিরে ফেলেছি তাঁকে ; কেউ ফরমাশ করছি হাসির গল্প, কেউ যুদ্ধের, কেউ ডিটেকটিভ। তাঁর হাসির গল্প শুনতে-শুনতে আমাদের নাড়ি ছেঁড়ে, ভয়ের গল্পে প্রায় নাড়ি ছাড়ে, আর ডিটেকটিভ গল্পে ডলুর মুখটা আস্ত আলুসেদ্ধ খাবার মতো হাঁ হ'য়ে থাকে সারাক্ষণ। এমনি আমাদের সুজিত-দা, আর সেই সুজিত-দা এলে খুশি হবো না তো কিসে খুশি হবো বলো তো ?

আমি প্রায়ই সুজিত-দাকে বলি, 'আপনি তো গল্পগুলি লিখে ফেললেই পারেন,' কিন্তু সুজিত-দা কানেই তোলেন না। সেদিনও আবার বলছিলাম, তখন সুজিত-দা জবাব দিলেন, 'জ্যাঠামশাই এত লেখেন, তার উপর আমি আবার—!'

'সুজিত-দা, আপনি হারান-জ্যাঠার বই পড়েছেন ?' আমি জিগেস করলাম।

'নিশ্চয়ই !' গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন সুজিত-দা, 'আমি তো সক্কলের আগে পড়ি। লিখতে-লিখতেই প'ড়ে শোনান কিনা আমাকে।'

আমিও গম্ভীরভাবে বললাম, 'ভাগ্য আপনার !'

'ভাগ্য না ?' সুজিত-দা আরো গম্ভীর হলেন। 'কত শিক্ষা হয় ওঁর বই পড়লে। তোমরা খুব মন দিয়ে পড়ো তো ?'

'পড়ি না ?' সুজিত-দার মতো ক'রেই বললাম আমি, আর সুজিত-দার সমান-সমানই গম্ভীর হলাম—ভাগ্যিশ ডলু-বুলু কেউ ছিলো না সেখানে !—'হারান-জ্যাঠার বই যেমন লাগে, আমার তো আর-কোনো বই তেমন লাগে না।'

'আমারও না !' সুজিত-দা তক্ষুনি একমত হলেন আমার সঙ্গে। 'আর এখনই কী—যেখানা লিখছেন এখন—ওঃ! সেই একখানা পড়লে আর-কোনো বই পড়তে হবে না তোমাকে !'

'আশ্চর্য বই বুঝি ?'

'আশ্চর্য !'

আমি আর-কিছু বললাম না—এমন হাসি পাচ্ছিলো। সুজিত-দা পারেনও নিজে গম্ভীর থেকে অন্যকে হাসাতে!

এর পর হারান-জ্যাঠা যেদিন এলেন—'কই, কোথায় সব?' দরজা থেকেই বলতে-বলতে ঢুকলেন—'আরে, শোন, শোন, মস্ত খবর আছে।'

একেবারে সামনে প'ড়ে গিয়ে আমাকে বলতেই হ'লো: 'কী, জ্যাঠামশাই, কী?'

'কই, ডলু-বুলু কোথায়, আর দুষ্টু চিত্রাটা?' পকেটে হাত দিয়ে একটু চিন্তিতভাবে বললেন, 'কাজুবাদাম তোরা ভালোবাসিস তো?'

ডলু-বুলু ঠিক সময় বুঝে হাজির—চিত্রাটাও—; আর কাজুবাদাম যে আমরা কত ভালোবাসি, হাতে-মুখে তার প্রমাণ দিতে একটুও দেরি করলাম না আমরা।

'শেষ হ'লো রে,' ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে হারান-জ্যাঠা বললেন, 'সেদিন শেষ করলাম রাত চারটের সময়।'

'আপনার সেই নতুন বই বুঝি? যেটা লিখছিলেন?' আমি আমার কর্তব্য করলাম।

'হ্যাঁ রে—শেষ হ'লো।' অত দাড়ির মধ্যেও একটু লাজুকভাবে হাসলেন হারান-জ্যাঠা।

'নতুন বই? দেখি? দেখি?' ব'লে ডলু ইজি-চেয়ারের হাতল ধ'রে লাফালো, আর ডলুকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে এলো বুলু—'না, আমাকে আগে।'

'ছাখো! কাণ্ড ছাখো এদের!—আরে, লেখা হ'লেই কি আর বই হ'য়ে গেলো! ছাপা হবে, তবে তো!'

'কবে হবে? কবে ছাপা হবে?'

'তা—মাসখানেক তো লাগবে।'

'অত ?' ডলু-বুলু মুষড়ে পড়লো একেবারে, 'না, জ্যাঠামশাই, অতদিন না। আরো তাড়াতাড়ি ছেপে দিতে বলুন ওদের।'

'তোদের মতো গরজ তো আর ওদের না !—'

'তাই ব'লে একমাস ব'সে থাকবো আমরা !' ডলু প্রায় কাঁদো-কাঁদো।

'নাঃ—তোরা দেখছি কিছুতেই ছাড়বি না আমাকে। তাহ'লে একদিন এসে প'ড়েই শোনাবো তোদের।—কেমন, হ'লো তো ?'

আমি দেখলাম, ডলু-বুলুর মুখটা সত্যি কাঁদো-কাঁদো হয়েছে এবার। চট ক'রে বুদ্ধি জোগালো ; বললাম, 'না জ্যাঠামশাই, আপনি পড়লেও শুনবো না আমরা। আপনি সব লেখা সুজিত-দাকে আগে শোনান কেন ?'

'ও, সুজিতটা তোদের কাছেও বলতে ছাড়েনি।' হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন হারান-জ্যাঠা।

আমি বললাম, 'আপনার নতুন বইয়ের কথা শুনলাম সুজিত-দার কাছে—আশ্চর্য বই নাকি হয়েছে !'

'তাও বলেছে ! নাঃ, কেন যে সুজিতের এত ভালো লাগে ! আমি আরো ভাবি, এ-সব শিক্ষার কথা কেউ তো শুনতে চায় না আজকাল, কিন্তু সুজিত—'

'ঐ তো !' ব'লে উঠলো ডলু, 'আপনার মুখে খালি সুজিতের কথা ! আমরা বুঝি আর কেউ না ?'

'তোরাই তো সব !' বড়ো-বড়ো চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে হারান-জ্যাঠা আমাদের প্রত্যেকের দিকে তাকালেন। 'সুজিত এখন বড়ো-সড়ো হয়েছে—আমার বই তো আর ওর জন্য না ! তাই তো ভাবছি আমি—তোদের কেমন লাগবে—অত বড়ো বৃহৎ একটা বিষয় !'

কী বিষয়, বইয়ের নাম কী, এ-সব প্রশ্নের উত্তরে হারান-জ্যাঠা শুধু হেসে-হেসে মাথা নাড়লেন আর বললেন, 'দেখবি, দেখবি ! সবুর কর ক-টা দিন !'

আরো অনেকদিন সবুর করতে আপত্তি ছিলো না আমাদের—কিন্তু সত্যি-সত্যি একদিন সেই দিন এসে পড়লো। বড়ো-বড়ো অক্ষরে নাম লিখে-লিখে আমাদের প্রত্যেককে—চিত্রাকেও—একখানা ক'রে উপহার দিলেন হারান-জ্যাঠা—পাৎলা মলাটে, লালচে কাগজে খুদে-খুদে ছাপানো অক্ষরের সারি।

বইয়ের নাম, 'ঈপ্সিত ঈশ্বর'!

মিনিটখানেক টুঁ শব্দটি নেই ঘরে, তারপর হারান-জ্যাঠা বললেন—'কেমন?'

'কী কাণ্ড করেছেন, সত্যি!' ব'লে আমি পাতা ওল্টালাম।

'শিশুদের ধর্মশিক্ষারও ব্যবস্থা করলাম,' হারান-জ্যাঠা গম্ভীর—ও-রকম গম্ভীর আর কখনো তাঁকে দেখিনি। 'ওটাই হ'লো সব শিক্ষার মূল, কিন্তু কেউ কি সে-কথা ভাবে আজকাল?'

আমার মুখে কথা জোগালো: 'আর-কেউ না-ই ভাবলো, আপনি তো ভেবেছেন!'

'আমাদের সব ইচ্ছাই—ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের ইচ্ছাও আসলে যে ঈশ্বরের জন্যই ইচ্ছা, এই আরকি কথাটা। সহজ ক'রেই বলেছি। প'ড়ে দেখিস।'

আমার মনে হ'লো—অবাক লাগলো—হারান-জ্যাঠা একটু যেন বিমর্ষ। তাই চোখ-মুখ চকচকে ক'রে বললাম, 'এখন বুঝতে পারছি সুজিত-দা কেন আশ্চর্য বই বলেছিলেন।'

হারান-জ্যাঠা উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ, এতদিনের মধ্যে এই প্রথম তাঁর মুখ কালো দেখলাম। বললেন, 'সুজিতের কথা আর বলিস না আমার কাছে।'

আমার মাথায় যেন একটা বাড়ি পড়লো। সুজিত-দার কথা আর বলবো না…? হারান-জ্যাঠা সব সময় যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, যার নাম করতে তাঁর হাসি ধরে না, সেই সুজিত-দা!

—'হয়েছে কী, জ্যাঠামশাই?'

'না, থাক, সে আর তোদের শুনে কাজ নেই।'

'সুজিত-দা কি—' সাহস ক'রে ব'লেই ফেললাম কথাটা—'আপনার এই বইয়ের বিষয়ে কি কিছু—'

'না রে, তাহ'লে তো ভালোই ছিলো', হারান-জ্যাঠা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

'তাহ'লে—?' আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলাম, চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলাম মুখের দিকে।

হারান-জ্যাঠা দরজার দিকে এগোলেন, যেন চ'লেই যাচ্ছেন, কিন্তু হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে খপ ক'রে আমাকে চেপে ধরলেন কাঁধের তলায়, গলা নামিয়ে, আর আমি যেন তাঁর সমান-সমান মানুষ, এমনিভাবে বললেন, 'সুজিত করেছে কী জানিস? একটা বই লিখে ছাপিয়েছে!'

'—অ্যাঁ!'

'কী বই জানিস? বইয়ের নাম কী, জানিস? বইয়ের নাম—' বলতে-বলতে হারান-জ্যাঠার গলা ভাঙলো—'বইয়ের নাম, "গায়ে কাঁটা, পেটে খিল"!'

'অ্যাঁ!!!' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি আর ডলু আর বুলু।

হারান-জ্যাঠা বুঝলেন না এটা আমাদের উল্লাসের চীৎকার, আস্তে-আস্তে আবার উচ্চারণ করলেন নামটা, "গা-য়ে কাঁ-টা, পে-টে খি-ল"!—ওঃ!' যন্ত্রণার একটা আওয়াজ বেরোলো তাঁর গলা দিয়ে।

ডলু বুলু তো পালিয়েই গেলো সেখান থেকে, আর আমি যে কত কষ্টে আনন্দ চেপে রাখলাম তা আমিই জানি। খুব চেষ্টা ক'রে দুঃখের সুর আনলাম গলায়, 'শেষটায় সুজিত-দাও—!'

'শেষটায় সুজিতও!' হারান-জ্যাঠার গলা বুজে এলো; প্রায় ফিশফিশ ক'রে বললেন, 'আমার তো বিশ্বাসই হয়নি, কিন্তু ওরা সবাই বললো···আবার টাকাও নাকি পেয়েছে তার জন্য। তা,

টাকার দরকার হয়েছিলো, আমাকে বললেই—কিন্তু না, কিচ্ছু বলেনি আমাকে, একটি কথা না।' তাঁর দীর্ঘশ্বাসে ঘরের হাওয়া ভারি হ'য়ে উঠলো।

আমি প্রাণপণে গম্ভীর থেকে বললাম, 'কোন মুখে আর বলবে!'

'যাক…তুই আবার ওকে কিছু ব'লে-ট'লে ফেলিস না—কাজটা ক'রে ফেলে নিজেই লজ্জা পেয়েছে—আমার কাছে আর মুখই দেখায় না। বুদ্ধিমান ছেলে, বোঝে তো!'

আর-কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'লো, হারান-জ্যাঠাও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন একটু, তারপর মুহূর্তের জন্য একটু যেন জীইয়ে উঠে বললেন, 'আজ চলি রে। আসবো আবার—শিগগিরই আসবো—কেমন লাগলো তোদের এটা—তোরাই তবু যা-হোক একটু—এ-সব তো কেউ চায় না, সত্যি।'

আমি অভ্যেসমতো তাঁর শেষ কথাটার প্রতিবাদ করলাম, কিন্তু হারান-জ্যাঠার মুখে আলো ফুটলো না সেদিন, নিচুমাথায় চ'লে গেলেন কেমন-একরকম থপথপ ক'রে হেঁটে-হেঁটে।

আর, তারপর আজ—এই তো কয়েক ঘণ্টা আগেকার কথা। সুজিত-দা অবশ্যি একখানা বইতেই চারজনের নাম লিখে দিয়েছিলেন আমাদের, কিন্তু তা নিয়ে এমন কাড়াকাড়ি হ'লো যে আমি তক্ষুনি বেরিয়ে একখানা কিনে এনেছিলাম দোকান থেকে, তারপর ডলু-বুলুতে এমন ঝগড়া হ'লো যে ডলুকে কিনতে হ'লো একখানা, আর তার একঘণ্টার মধ্যে, চিত্রা টানাটানি করে ব'লে, বুলুটা আরো-একখানা না-কিনে ছাড়লো না!—সত্যি, সুজিত-দার কাণ্ড!—কিচ্ছু বলেননি আগে, তলে-তলে এই করেছেন! কী-ছবি, কী-রকম ঝকঝকে মলাট, কী-চমৎকার কাগজ—আর গল্প, গল্পগুলির কথা কী আর বলবো। এতবার তো শুনেছি মুখে, তবু প'ড়ে-প'ড়ে আশ মেটে না—আর কী-সুন্দর নাম দিয়েছেন বইয়ের! সত্যি গায়ে কাঁটা, সত্যি পেটে খিল!

আজ রোববার। সকাল থেকেই আমরা তিনজনে তিনখানা নিয়ে বসেছি, আর চিত্রাটা মেঝেতে উপুড় হ'য়ে আর-একখানার ছবি দেখছে, আর আমাদের দেখাদেখি এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন কতই পড়তে পারে। কেউ আমরা হী-হি ক'রে হাসছি, কেউ 'উঃ' ব'লে ভয়ের চীৎকার দিচ্ছি ; কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছি না, অন্য কোনোদিকেই তাকাচ্ছি না, চেয়ারের মধ্যে নানারকম ট্যারাবাঁকা হ'য়ে বসেছি আমরা, আমাদের মুখও বোধহয় দেখা যাচ্ছে না ভালো ক'রে—বইতেই ঢাকা। কতক্ষণ এ-রকম কেটেছিলো জানি না ; হঠাৎ একটা সাংঘাতিক হাসির কথায় আমি একেবারে হাত-পা ছুঁড়ে হেসে উঠলাম, বইটা আমার হাত থেকে খ'সে পড়লো, আর সেটা তুলতে গিয়ে যেই আমি চোখ তুলেছি, অমনি আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হ'য়ে, হিম হ'য়ে, বরফ হ'য়ে জ'মে গেলো।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে—হারান-জ্যাঠা।

আমি নড়তে পারলাম না, কিছু বলতে পারলাম না, আর তক্ষুনি ডলুটা হেসে উঠলো বিকটরকম আওয়াজ ক'রে। পাথরের মূর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে, পাথরের চোখের মতো পলক-ছাড়া চোখ মেলে হারান-জ্যাঠা তাকিয়ে রইলেন ঠিক সামনে—আর তাঁর ডাইনে-বাঁয়ে জ্বলজ্বল করতে লাগলো চার-রঙা মলাটের উপর দগদগে লাল অক্ষরে ছাপানো—'গায়ে কাঁটা, পেটে খিল'।

আর হঠাৎ আমার গলা দিয়ে—কী ক'রে বুঝলাম না—ছোট্ট একটা চীৎকার বেরিয়ে গেলো। ছোট্ট আওয়াজ, কিন্তু তাতেই ওরা তিনজন চোখ তুললো, ভীষণ বোকার মতো হ'য়ে গেলো ওদের মুখগুলো—কিন্তু তা দেখবার সময় ছিলো না আমার, আমি উঠলাম, এগোলাম—কিন্তু যেতে পারলাম না, আমি যেদিকে তাকাচ্ছি, হারান-জ্যাঠাও সেদিকে চোখ ফেললেন, চোখ নামিয়ে দেখতে পেলেন তাঁর পায়ের কাছে, প্রায় তাঁর জুতো ছুঁয়ে প'ড়ে আছে—দেখতে সেটা বাজে কাগজের মতোই, কিন্তু আসলে একখানা ছেঁড়াখোঁড়া—'ঈপ্সিত ঈশ্বর'।

হারান-জ্যাঠা তাকালেন আমার দিকে, ডলুর দিকে, বুলুর দিকে, ছোট্ট চিত্রার দিকেও। একটা অদ্ভুত ফ্যাঁশফেঁশে আওয়াজ বেরোলো তাঁর গলা দিয়ে—'আচ্ছা—' একটু থেমে, 'আচ্ছা—' আবার থেকে—'আচ্ছা।' তিনবার যেন কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর সব বলা ঐ একটি শব্দেই শেষ হ'লো। তারপর, যেমন হঠাৎ তাঁকে দেখেছিলাম দাঁড়িয়ে থাকতে, তেমনি হঠাৎ তাঁকে আর দেখতে পেলাম না।

* * *

একটু আগে ব্যস্ত হ'য়ে খবর দিতে এসেছিলেন সুজিত-দা। ভীষণ কাণ্ড তাঁদের বাড়িতে।

—কী? কী হয়েছে?

সুজিত-দা বললেন, 'জ্যাঠামশায়ের মাথা-খারাপ হ'য়ে গেছে। সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলছেন—তাঁর "বিশ্ববীক্ষা", "পদার্থপরিচয়", "স্বাস্থ্যসিদ্ধি", "ভূগোলভঙ্গিমা", আর সেদিন যেটা লিখলেন—ওঃ—রাশি-রাশি বই—সব পুড়িয়ে ফেলছেন নিজের হাতে—কাউকে কাছে আসতে দিচ্ছেন না। কী-কাণ্ড!—এত রাত জেগে এত খেটে-খুটে লিখেছিলেন তো যা-ই হোক—আর বেশ একটা "হবি" ছিলো বুড়ো-বয়সের!—কী কাণ্ড।'

সুজিত-দার আর কী দোষ, কিন্তু হঠাৎ সুজিত-দার উপরেই বড্ড রাগ হয়েছে আমার; হাতের কাছে 'গায়ে কাঁটা, পেটে খিল' যেটা পেয়েছি, সেটার মলাটের উপর এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছি, এখন কাঁচি দিয়ে কুচি-কুচি ক'রে কাটছি ব'সে-ব'সে।

সমাপ্ত